# অন্য আলোয় দেখা

ফাহমিদ-উর-রহমান

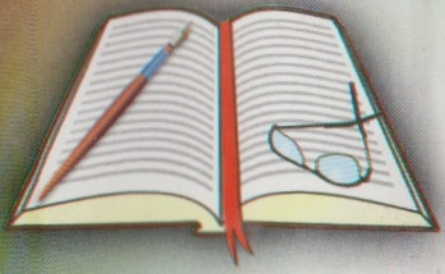

# অন্য আলোয় দেখা

ফাহমিদ-উর-রহমান

প্রকাশনায়
বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা

www.pathagar.com

**Anno Aloy Dekha**
Written by : **Fahmid-Ur-Rahman.**
**Published by** Abdul Mannan Talib.
Director, Bangla Shahitta Parishad.
171, Bara Maghbazar, Dhaka-1217.
Phone: 9332410
**Price Tk.60.00 Only.**
**ISBN-984-485-062-2**
**BSP-102-2002**

**অন্য আলোয় দেখা**
**ফাহমিদ-উর-রহমান**

**প্রকাশক**
আবদুল মান্নান তালিব
পরিচালক, বাংলা সাহিত্য পরিষদ
১৭১, বড় মগবাজার, (ডাক্তারের গলি)
ঢাকা-১২১৭
ফোন-৯৩৩২৪১০

**প্রথম প্রকাশ**
জুন ২০০২

**লেখক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত**

**বাসাপপ্র ১০২**

**প্রচ্ছদ**
ওয়ার্ল্ড কালার গ্রাফিক্স, ঢাকা

**মূদ্রক**
ক্রিসেন্ট প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা

**বিনিময়: ৬০ টাকা মাত্র**

www.pathagar.com

উৎসর্গ

মরহুম মোঃ সিদ্দিক হোসেনকে
যাঁকে দেখিনি,
যাঁর কথা শুনেছি।

www.pathagar.com

# প্রকাশকের কথা

বিশ শতক আমাদের চিন্তায় ও মননে একটা সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলেছে। বিগত এই শতকটা চতুরমুখী ভাঙাগড়ার কাজ করেছে অতি দ্রুতগতিতে। আমরা ছিলাম কোরআনের চিন্তার ধারক ও বাহক। কিন্তু এই শতকটা আমাদের সেদিকে তাকাবার ফুরসত দেয়নি। আমাদের মনের দুয়ারে আঘাত হেনেছে। চিন্তায় পরিবর্তন এনেছে। জীবনকে নতুন করে গঠন করার বহুমুখী আয়োজন করেছে। আমরা কোরআন থেকে দূরে সরে এসেছি। আমাদের চিন্তাশীলরা বহুধা বিভক্ত। তবে পশ্চিমের প্রভাব কমবেশী গ্রহণ করার ব্যাপারে তাদের মধ্যে একটা ঐক্যচেতনা লক্ষ্য করা যাবে। এই সংগে কোরআনের চিন্তাকে অবজ্ঞা করার ও বিসর্জন দেবার প্রয়াসও।

কালের স্রোতের মুখে আত্মসমর্পণ করা ইসলামের প্রকৃতি নয়। কাল তার নিজস্ব গতিতে চলে। ইসলাম এই গতির মুখে লাগাম দিয়ে নিয়ন্ত্রকের আসন দখল করে। কাল এগিয়ে চলে : ইসলাম তাকে নিজের মতো করে এগিয়ে নিয়ে যায়। প্রতি যুগে কিছু ইসলামী চিন্তাবিদ এগিয়ে এসেছেন। তাঁরা কালকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। কালের গতিধারার কাছে অসহায়ের মতো আত্মসমর্পণ না করে নিজের মতো করে এগিয়ে যাবার প্রয়াস চালিয়েছেন। বিশ শতকী চিন্তার প্লাবনে আমাদের জীবনে যেসব পরিবর্তন এসেছে এবং আমাদের চিন্তায় ও মননে যেসব ভাঙন ধরেছে মুসলিম লেখক ও চিন্তাবিদগণ সেগুলি চিহ্নিত ও সংশোধন করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক ফাহমিদ-উর-রহমান এই পেক্ষাপটে ইসলাম ও মুসলমানদের সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতি রাজনীতি শিক্ষা ইতিহাস ইত্যাকার বিষয়াবলীকে সঠিক ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার প্রয়াসে এই রচনার অবতারণা করেছেন। প্রত্যেকটি রচনার মধ্যে তিনি যে ইসলামী ভাবধারা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন তা তাঁর এই রচনাগুলিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। গতানুগতিকভাবে আমরা যে বিষয়গুলি জানতাম সেগুলির মধ্যে যে আরো গভীরতর তথ্য ও বাণী রয়েছে তা উদ্ধার করার চেষ্টা লেখক করেছেন। এ বিষয়ে পাঠকগণ অবশ্যই নতুনভাবে চিন্তা করতে পারবেন। বিশ শতকী চিন্তার অতলে তলিয়ে না গিয়ে তারা যাতে নতুনভাবে নিজেদেরকে উজ্জীবিত করতে পারেন এবং ইসলামী চিন্তার গতিময়তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন এই উদ্দেশ্যে আমরা এ প্রবন্ধ সংকলনটি প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছি।

আশা করি পাঠকগণ এতে লাভবান হবেন।

www.pathagar.com

# অন্য আলোয় দেখা

ফাহমিদ-উর-রহমান

www.pathagar.com

## সূচিপত্র

১। শতবর্ষের মুসলমান ❐ ৭
২। জ্ঞানের ইসলামীকরণ ❐ ৯
৩। ইকবালকে আমাদের কেন প্রয়োজন ❐ ১১
৪। ইকবাল সম্পর্কে কয়েকটি কথা ❐ ১৫
৫। মদীনা সনদ ❐ ২০
৬। মোহাম্মদ আসাদ ❐ ২২
৭। কোরআনে মানুষের মন ❐ ২৬
৮। গালিব ❐ ৩১
৯। দিউয়ানে শামস-ই-তাব্রীজ ❐ ৩৪
১০। ফাতেহা-ই-দোয়াজ দাহাম ❐ ৩৮
১১। দান্তে ও ইসলাম ❐ ৪০
১২। জামালুদ্দীন আফগানী ❐ ৪২
১৩। নজরুল ঃ পথিকৃত কবি ❐ ৪৫
১৪। ফররুখ কাব্যে নান্দনিকতা ❐ ৪৭
১৫। বঙ্গভঙ্গ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্রনাথ ❐ ৫৩
১৬। বঙ্গভঙ্গ ও সেকালের হিন্দু মানস ❐ ৫৭
১৭। দি স্পিরিট অফ ইসলাম ❐ ৬০
১৮। নওয়াব আবদুল লতিফ স্মরণে ❐ ৬৩
১৯। বাংলা ভাষার ইসলামী শব্দ ❐ ৬৭
২০। শিক্ষা সংকট ❐ ৭২
২১। ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ঃ কিছু স্মৃতি কিছু অনুভূতি ❐ ৭৭
২২। ডঃ হাসান জামান ❐ ৮৪
২৩। বখতিয়ার খিলজী যদি না আসতেন ❐ ৮৬
২৪। প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ ❐ ৯২
২৫। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ঃ এক বিকেলের স্মৃতি ❐ ৯৪

www.pathagar.com

# শত বর্ষের মুসলমান

উনিশ শতকের মুসলমান বাঙ্গালীর ইতিহাস ধর্মান্দোলন, ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আর বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল এক ইসলামের সন্ধানে গত হয়েছে। ইংরেজের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে পুরো বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে এক বড় রকমের ভাংচুর চলেছিল। মুসলমানরা তাদের রাজ্য হারিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে শুধু বিদ্রোহের আওয়াজই তোলেনি, মুসলমান নেতারা সেদিন ভেবেছিলেন তাদের এই পরাজয়ের কারণ তারা প্রকৃত ইসলামের চেহারাকে তাদের জীবনে ফুটিয়ে তুলতে পারেননি, তাই তাদের পতন ঘটেছে। তাই তখনকার মত বিশুদ্ধ ইসলাম বিশেষ করে বাংলার মুসলমানদের জীবনে ওহাবী ও ফরায়েজী আন্দোলন এক বিশেষ তরংগের সৃষ্টি করেছিল। এ আন্দোলনের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ফলাফল কি হয়েছিল সে আলোচনায় না যেয়েও এটা আজ নির্দ্বিধায় বলা যায় প্রেরণা হিসেবে ওহাবী ও ফরায়েজী আন্দোলন সেদিনের রাজনীতিতে এক বড় ধরনের ঝড় তুলেছিল। বৃটিশ আমলা উইলিয়াম হান্টারের রিপোর্টে সে গৌরবজনক কাহিনী কিছুটা বিবৃত হয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের স্বাধীনতার এই স্পৃহা তাদের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক চেতনার একটা বড় রকমের প্রকাশ বলা চলে। বৈরী ইংরেজের রাহুগ্রাসে মুসলমানদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার খর্ব হয়েছিল, তাদের সামর্থ্যের সীমাহীন দীনতা তাদের জীবন জীবিকার সব পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল, তারপরেও তাদের সাংস্কৃতিক শক্তিকে খুব একটা ব্যহত করা সম্ভব হয়নি। ধর্ম হিসেবে ইসলাম খুব সুস্পষ্ট। তাই তার নড়চড় হওয়াও শক্ত। ইসলামের এই স্পষ্টতার কারণেই তাই তার অনুসারীদের সাংস্কৃতিক বুনিয়াদে ভাঙ্গন ধরানো যেমন সম্ভব হয়নি তেমনি ঐ একই জোরে মুসলমানরাও পুনঃ পুনঃ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে। মুসলিম জীবনের এই বিদ্রোহী ধারা কিন্তু সেদিনের শিক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দুদের প্রাণ স্পর্শ করেনি। বৃটিশের পৃষ্ঠপোষণায় শহর কলকাতাকে কেন্দ্র করে যে হিন্দু মধ্যবিত্তের উত্থান ঘটে তা ছিল পুরোটাই হিন্দুধর্ম ও সমাজকেন্দ্রিক। ঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যে এই হিন্দু জাগরণ পরবর্তীকালে এক স্বতন্ত্র পথ করে নিল এবং বিশ শতকের সূচনাতেই তা মুসলিম মানস ও সংস্কৃতির সাথে প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চলে এলো।

বঙ্কিমচন্দ্র, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখের হিন্দু রাষ্ট্রচিন্তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মুসলিম সমাজের মধ্যেও একটা ধর্মীয় রাষ্ট্র গঠনের প্রয়াস দেখা গেলো। এই সাংস্কৃতিক বিভাজনের ফল হলো এই যে, দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দুটো অঞ্চল মিলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হলো, পরিণামে ভারত হলো দ্বিখণ্ডিত। আর এ ভাবেই এ শতকে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের পথ ধরে মুসলমানরা একটা রাষ্ট্রীক পরিচিতি অর্জন করলো ও দুশো বছর পরে নতুন করে রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্বাদ পেলো। বিশ শতকে এসে মুসলমানদের এই অর্জন মূলত উনিশ শতকে সূচিত আন্দোলনের একটা প্রান্তিক ফলাফল মাত্র। কিন্তু কথা হচ্ছে উনিশ আর বিশ শতকে সূচিত এই আন্দোলনের মধ্যে একটা গুণগত তফাৎও রয়েছে। উনিশ শতকের আন্দোলনকারীরা ছিলেন দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়ে আপোষহীন। তারা যেমন শরীয়তী ইসলামের পুনরুজ্জীবন চেয়েছিলেন তেমনি বৃটিশের বিরুদ্ধে জেহাদেও তাদের ঈমানের কমতি ছিল না।

বিশ শতকের আন্দোলনকারীরা আপোষহীনতার স্থলে আপোষকামীতার কৌশল নিয়েছিলেন। বৃটিশের কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষা ও মূল্যবোধ দিয়ে তারা বৃটিশের মোকাবেলা করতে চাইলেন এবং সে কৌশল কতকটা সফলও হয়েছিল।


www.pathagar.com

আন্দোলনের প্রকৃতি যাই হোক না কেন মুসলমানদের পক্ষে ভারতীয় উপমহাদেশের বুক চিরে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিকার অর্জন সামান্য ব্যাপার ছিল না। অন্নদাশঙ্করের ভাষায় পাকিস্তান অর্জনের মাধ্যমে মুসলমানরা একটি সম্প্রদায় থেকে রাতারাতি জাতিতে পরিণত হলো। আর এও মনে রাখা প্রয়োজন পাকিস্তানের ধারাবাহিকতায় আজ বাংলাদেশের অভ্যুদয় সম্ভব হয়েছে। সৌভাগ্যবশত পূর্ব বাংলার মুসলমানরা সেদিন পাকিস্তান আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল, তাই খুব সহজেই তারা স্বাধীনতার মুখ দর্শন করতে পেরেছে। স্বতন্ত্রভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদ উৎপীড়িত ভারতীয় উপমহাদেশের বুক চিরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ব্যাপারটি প্রায় অকল্পনীয় ও অসম্ভব ব্যাপার ছিল। এটা সত্য ক্ষমতা ও নীতিহীনতার রাজনীতি পাকিস্তানের নৈতিক ভিত্তি সংশয়াপন্ন করে তুলেছিল এবং সেই নষ্ট নৈতিকতার ফাঁক গলে বাংলাদেশের জন্ম। পাকিস্তানের নেতাদের নৈতিক সামর্থ্যহীনতা যেমন ঐ রাষ্ট্রের সংহতিতে ধ্বস নামিয়েছিল তেমনি জন্মের পর থেকে একই কারণে বাংলাদেশের অধিবাসীদেরকেও এক দোলাচল মানসিকতার মধ্যে অতিবাহিত করতে হচ্ছে। অনেক সময় এর প্রকোপ এত মারাত্মক হয়ে ওঠে যে রাষ্ট্রের সংহতির উপরও তা প্রভাব ফেলে বৈকি। Identity Crisis বা অত্মপরিচয়ের সংকট রাষ্ট্রসত্তার ভবিষ্যৎ লক্ষ্য নির্মাণে কোন দিক নির্দেশনা দিতে পারে না।

বাংলাদেশ আন্দোলনের সময় এর নেতৃত্বের লক্ষ্য ছিল দ্রুত রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত করা, রাষ্ট্রসত্তার নৈতিক ও আদর্শিক ভিত্তি নির্মাণ নয়। ফল যা হবার হয়েছে। বিভিন্ন ও প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক আদর্শ যুগপৎ এদেশের মানুষকে নিকট অতীতের মত আজও টানছে। আর এটিই হলো একালের বাঙ্গালী মুসলমানের জীবনের ও সংস্কৃতির বড় ধরনের ট্রাজেডী।

উনিশ শতকের বাঙ্গালী মুসলমানের জীবনে যে সাংস্কৃতিক ঐক্য বিরাজমান ছিল বিশ শতকে এসে তা আর আগের মতো অটুট রইলো না। শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে দেখা গেলো বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যে বহু বৈপরিত্য ও দ্বন্দ্ব। একদিকে ধর্ম ঐতিহ্যের বিচিত্র শক্তি অন্যদিকে পাশ্চাত্যের মূল্যবোধ ও উনিশ শতকীয় বাঙ্গালী সংস্কৃতির প্রকোপে জাতির মধ্যে বিভক্তির লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। এই ভেদবুদ্ধির অভিশাপ থেকে রক্ষা পেতে হলে বাঙ্গালী মুসলমানকে আজ ঘুরে দাঁড়াতে হবে ও আপন ঐতিহ্যের মহিমাকে অনুভব করতে হবে। বাঙ্গালী মুসলমানের সংস্কৃতির আসল কাঠামো হওয়া চাই তৌহীদ ভিত্তিক, ভাষা ভিত্তিক কিংবা ভূখণ্ড ভিত্তিক জাতি রাষ্ট্র হিসেবে অন্যান্য অনেক মুসলিম দেশের মত বাংলাদেশের জন্য একালে সবচেয়ে বড় সংকট হচ্ছে ধর্মাদর্শের সাথে রাষ্ট্রীয় নীতির একটা প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব। মুসলমান সমাজ বাস্তবতার খাতিরে যেমন রাষ্ট্রের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখতে পারে না তেমনি ধর্মীয় আদর্শের চাপে তা পুরোপুরি গ্রহণ করাও সম্ভব হয় না। এই দ্বন্দ্বের একটা নিরসন হওয়া প্রয়োজন এবং সেটা করতে হলে ইসলামী নৈতিকতার ভিত্তিতে বাঙ্গালী মুসলমানের সংস্কৃতির নবনির্মাণ করতে হবে। প্রেরণা হিসেবে অবশ্যই আজও আমাদের কোরআনের কাছে হাত পাতা চাই, চাই রসূল (স) এর জীবন থেকে শিক্ষা নেয়া। জাতিকতার রাজনীতি আজ মুসলিম দুনিয়াকে বিখণ্ডিত করেছে এবং এই সম্মোহনের প্রতিক্রিয়া থেকে বাঙ্গালী মুসলমানকে আজ বের হয়ে আসতে হবে। তাকে বুঝতে হবে তার সংস্কৃতির একটা স্থানিক দিক আছে সত্য কিন্তু তার চেয়েও বড় সত্য সে বিশ্ব মুসলিম সংস্কৃতিরও সমান দাবীদার। এক আন্তর্জাতিক সমাজশক্তি হিসেবে ইসলামের এই মহামানবিক কাফেলায় বাঙ্গালী মুসলমানের তাই যথাযোগ্য আসন পাওয়া চাই। একবিংশ শতাব্দীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আজ আমাদের সেই প্রস্তুতি প্রয়োজন।


www.pathagar.com

# জ্ঞানের ইসলামীকরণ

জ্ঞানের ইসলামীকরণের ধারণাটা নতুন নয়। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে ইসলাম যে বিশেষ মূল্যবোধ আরোপ করে থাকে তার মৃত্তিকাই এ ধারণার উদ্ভব। কোরআনের মতে জ্ঞানের তিনটি উৎসঃ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান, ইতিহাস ও বিশ্বপ্রকৃতি। যুগ যুগ ধরে মুসলিম পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবীরা জ্ঞান সম্বন্ধে ইসলামের এই বিশেষ বিবেচনাকে সামনে রেখে তাদের কর্তব্য নির্ধারণ করেছেন এবং ভিন্ন ভিন্ন উৎস থেকে আহরিত জ্ঞানকে পারস্পরিক সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে মানব জীবনে কার্যকরী করে তুলবার কথা ভেবেছেন। মানব প্রকৃতি ও জ্ঞান সম্বন্ধে ইসলামের এই বিশেষ দৃষ্টিকোণের সাথে পাশ্চাত্যের সেকুলার পণ্ডিতরা ধর্মকে বাদ দিয়ে যে সব ধারণার বশবর্তী হয়ে জ্ঞান চর্চা করেন তার মধ্যে প্রকাণ্ড এক অমিল রয়েছে। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা যুক্তিবাদের (Rationalism) দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জ্ঞানের অন্যতম উৎস ওহী বা প্রত্যাদিষ্ট জ্ঞানের (Revealed Knowledge) যাথার্থ্যকে অস্বীকার করে থাকেন। কোরআনের মতে ওহীর জ্ঞান হচ্ছে বিশেষ প্রকৃতির এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত। মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা মনে করেন আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উপযোগিতাকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র যুক্তি নির্ভর হয়ে জ্ঞান চর্চা করতে গেলে মানবীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ভিত্তিটি বিপর্যস্ত হয়ে উঠতে পারে। এ কালে মুসলিম উম্মাহর বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসে পাশ্চাত্যের সেকুলার চিন্তা ভাবনার অনুপ্রবেশের ফলে ওহী ও আকলের (বুদ্ধি) মধ্যে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলে মুসলিম মানসে বস্তুবাদী প্রবণতা পল্লবিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। জ্ঞান চর্চায় ইসলামের দৃষ্টিকোণ প্রতিষ্ঠা করতে গেলে মানুষের সাথে আল্লাহর এবং মানুষের সাথে প্রকৃতির একটা সম্পর্ক বিধান করতে হবে এবং এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় মানুষ হবে প্রধান যোগসূত্র। মানুষের সাথে আল্লাহর সম্পর্কজাত যে জ্ঞান তা আমরা পাই ওহীর মাধ্যমে। এই জ্ঞানই হচ্ছে মানবীয় নৈতিকতার সারাৎসার। অন্যদিকে মানুষের সাথে প্রকৃতির সম্পর্কভিত্তিক জ্ঞানকে আমরা বলি বিজ্ঞান। এ ভিন্ন ধরনের জ্ঞানকে সমীকৃত করে কার্যক্ষমভাবে মানব জীবনে ব্যবহার করাই হচ্ছে ইসলামী নৈতিকতা ও মূল্যবোধের দাবী। মধ্যযুগে মুসলিম চিন্তার জগতে গ্রীক যুক্তিবিদ্যার প্রভাবে এক ধরনের অস্থিরতার জন্ম হয় এবং কোন কোন মুসলিম বুদ্ধিজীবী ওহী ও আকলকে বিচ্ছিন্ন করে মানবীয় জ্ঞান ও চিন্তাকে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেন। ইবনে রুশদ, আল ফারাবী প্রমুখ চিন্তা নায়কেরা এ ধারার পথিকৃত ছিলেন। পরবর্তীকালে অবশ্য ইমাম গাজ্জালীর মত মনীষা যুগের এই সংকটকে মোকাবেলা করতে এগিয়ে আসেন এবং দৃঢ়তার সাথে মত প্রকাশ করেন ইসলামী নৈতিকতায় মানুষের অন্তরবিশ্ব (আনফুস) ও বহির্বিশ্ব (আফাক) উভয়ই হচ্ছে মানবীয় অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের উৎস। এর বিচ্ছিন্নতা ইসলামের সামগ্রিক চৈতন্য ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি কোরআনের আবেদনের পরিপন্থী।

আধুনিক কালে জ্ঞানের ইসলামীকরণের কথা জোরে শোরে বলেছেন ফিলিস্তিনের পণ্ডিত ও চিন্তাবিদ মরহুম অধ্যাপক ইসমাইল রাজী আল ফারুকী। গত কয়েক শতকে বিশেষ করে এ শতকে মুসলিম দেশগুলোতে উপনিবেশবাদের পরিণাম স্বরূপ এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থায় যে পাশ্চাত্যের থাবা বিস্তৃত হয়েছে তার শিকড় উপড়ে


www.pathagar.com

ফেলার উপায় হিসেবে তিনি জ্ঞানের ইসলামীকরণের রূপরেখা হাজির করেছেন। কেন না পশ্চিমী শিক্ষার প্রাদুর্ভাবের ফলে মুসলিম উম্মার প্রকৃত অবক্ষয়ের সূচনা হয়েছে এবং সেখানকার বস্তুবাদী সভ্যতা আমাদের মন মানসিকতাকে ধীরে ধরে গ্রাস করছে। ফলস্বরূপ মুসলমানরা একটা অনুকারী জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। অপর সভ্যতার অনুকরণে তারা এখন ব্যস্ত। এই ব্যস্ততা কিন্তু তাদের জীবনে সফলতার সওগাত বহন করে আনেনি। উল্টো মুসলিম সমাজের এক অংশের মধ্যে ইসলাম বিমুখতা বাকীদের মধ্যে নৈতিক অধঃপতন ও হীনমন্যতা সৃষ্টিতে সফল হয়েছে। এক কথায় পাশ্চাত্য শিক্ষার মূল্যবোধ মুসলমানদেরকে এক নীরব অনৈসলামীকরণের (de-Islamisation) সেতুতে তুলে দিয়েছে। ইসমাইল রাজী আল ফারুকী তাই যথার্থ বলেছেন, জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে এখন ইসলামী দর্শনের আলোকে পুনর্গঠিত করবার সময় এসেছে। এ পুনর্গঠনের সময় খেয়াল করবার বিষয় হচ্ছে তৌহীদের মূলনীতিগুলো যাতে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাতে যথার্থভাবে সন্নিবেশিত হতে পারে। কেননা আল্লাহর ইচ্ছা ও পরিধির বাইরে ইসলাম কোন কিছুকেই জীবন্ত, সৃষ্টিশীল ও অস্তিত্ববান হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না।

ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞানের প্রকৃত রূপ তাই এক ধরনের সত্যের ঐক্যের মধ্যে নিহিত। এই সত্য আল্লাহর একত্বের ধারণা থেকে উদ্ভূত। যুক্তি যখন সংকট উত্তরণে ব্যর্থ হয় ঈমানের আলো তখন আমাদের পথ নির্দেশ করে এবং ওহীর অভ্রান্ত উৎসের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। আল্লাহ প্রদত্ত বাণী বা ওহী আল্লাহর অস্তিত্ব ও তার সৃষ্টি সম্বন্ধে ধারণা দেয়া ছাড়াও এ জগত সম্বন্ধে মানুষকে শিক্ষা দেয় এবং এ জগতে মানুষের কর্তব্যবোধের দিকেও অঙ্গুলি নির্দেশ করে। ইসলামী জ্ঞানতত্ত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে মানুষ হচ্ছে পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা। আল্লাহর বিধান প্রতিপালন হচ্ছে এ খেলাফতের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর এ খেলাফতের প্রতিষ্ঠার মধ্যে এ পৃথিবীতে এক উন্নততর সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতিষ্ঠাও হচ্ছে এর অন্যতম চূড়ান্ত লক্ষ্য। সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতি ইসলামের অঙ্গীকার থাকা স্বত্বেও ঐশী ঐক্যের পূর্ণতা লাভ ঘটে মানবজাতির একক সত্তাকে প্রতিষ্ঠা করার মধ্যে। একক সত্তা হিসেবে এক অখণ্ড, অবিভাজ্য মানবসত্তার সাথে এর সম্পর্ক। এটাই ইসলামের সার্বজনীনতার ভিত্তিভূমি। জাতিগত অহমিকা এই সার্বজনীনতার চেহারাকে মলিন করে ফেলে এবং তাতে মানবতার ঐক্য ও আল্লাহর একত্ব দুইই লংঘিত হয়। আধুনিক কালে মানুষের তামাম জ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে সংকীর্ণ জাতিসত্তা। পশ্চিমীরা অবিশ্রান্তভাবে মানবতার বুলি আউড়ালেও তারা কেবল পশ্চিমী মানুষ ও পশ্চিমী মানবতাকেই বুঝায়। এর বাইরে যে বিরাট পৃথিবী আছে আর সেখানে বিপুল সংখ্যক মানুষ বিদ্যমান, তাদেরকে ছলে বলে কৌশলে শোষণ করার মধ্যেই তাদের কথিত মানবতার চিত্র ফুটে ওঠে। অন্যপক্ষে ইসলামের আবেদন হচ্ছে বৈশ্বিক ও কালিক বিচারের অতীত। ইসলামের জ্ঞানতত্ত্বের মূল কথা হচ্ছে এক আন্তর্জাতিক সমাজশক্তি হিসেবে মানবতার অধিষ্ঠান ঘটানো। সে লক্ষ্যেই জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে ইসলামের এই বিশ্বজনীনতার আলোকে পুনর্বিন্যাস করবার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে।



www.pathagar.com

# ইকবালকে আমাদের কেন প্রয়োজন

অর্ধশতাব্দী কাল অতিক্রান্ত হয়েছে ইকবাল আমাদের ভিতর থেকে বিদায় নিয়েছেন। জীবদ্দশায় মুসলিম জাতির হতাশা, পরানুখতা ও উদ্দমহীনতার জন্য তার বেদনার শেষ ছিল না। তাই নতুন দিনের রাজপথে, জাগৃতির আলোক বর্তিকা বহন করবার জন্য তিনি সারা দুনিয়ার ঘুমন্ত মুসলমানকে উদাত্ত আহবান জানিয়েছিলেন। ইকবালের ইন্তেকালের পর অন্তবর্তী সময়ে পৃথিবী নামক আমাদের এই উপগ্রহে ঘটেছে বিস্তর রূপান্তর ও পরিবর্তনের ঢেউ। একদিকে যেমন বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তেমনি মানুষ অর্জন করেছে ঐহিক সমৃদ্ধি। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংহতির অবকাঠামো এতদূর বিস্তৃতি লাভ করেছে যে পুরো পৃথিবীটাকেই মানুষ গ্লোবাল ভিলেজে রূপ দিতে চলেছে।

একই সময় এর পাশাপাশি মানবতার বিশেষত মুসলমান জনপদগুলোতে অপমান, দলন ও পীড়ন পৌনঃ পৌনিক গতিতে তীব্রতা অর্জন করেছে। মুসলমান দেশগুলোর অনৈক্য, অবিশ্বাস আর আদর্শবিহীনতা পৃথিবী জুড়ে মুসলমানদের ভাগ্যাকাশে অহর্নিশ কালো মেঘের আশনি সংকেত দিয়ে চলেছে। ইকবাল তার সমকালে সাম্রাজ্যবাদ কবলিত মুসলিম দুনিয়ার জীর্ণ চেহারা দেখে গিয়েছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনাটা তার চোখের উপরেই ঘটেছিল। দুই মহাযুদ্ধের সময়কালের মধ্যেই তিনি দেখেছিলেন সমাজতন্ত্রের জাগরণ এবং ফ্যাসিবাদের উত্থান। ইকবাল ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন রূপটিও পুরোপুরি ধরতে পেরেছিলেন। স্বকালের প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে কবি মানবতার যে লাঞ্ছনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন বিশেষত পৃথিবী জুড়ে মুসলমানদের দুঃসহ বঞ্চনা তার অনুভূতিকে যেভাবে আলোড়িত করেছিল তার বিচারে মুসলমানদের বর্তমান অবস্থান মোটেই ভিন্নতর কিছু নয়। এই মুহূর্তের সত্যগুলো যদি আমরা গভীরভাবে পুনঃর্বিবেচনা করি তাহলে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে মুসলমানদের ভাগ্য বিপর্যয়ের যে ধারা ইকবাল প্রত্যক্ষ করে গিয়েছিলেন তা আজও বহাল তবিয়তে বিদ্যমান এবং তার থেকে অব্যাহতি পাওয়ার কোন সুলক্ষণ বোধ হয় আপাতত নজরে আসছে না। এটা সত্য সাম্রাজ্যবাদের গুহা থেকে ইতোমধ্যে মুসলিম জনপদগুলো বেরিয়ে এসে রাজনৈতিক আজাদী অর্জন করেছে কিন্তু তাদের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তি আজও সুদূর পরাহত রয়ে গেছে। আর কে না জানে রাজনৈতিক আজাদী কখনোই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না যতক্ষণ না মুক্তির অপরাপর লক্ষ্য অর্জিত হয়।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো মুসলিম জনপদগুলো থেকে বিদায় নিয়েছে ঠিক কিন্তু তারা রেখে গেছে পাশ্চাত্যের জড়বাদী ও সেকিউলার চিন্তা ভাবনা যা এ সমস্ত জনপদের বিপুল সংখ্যক মুসলমানের মন মানসিকতাকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। তাই পৃথিবীতে আজ অনেক মুসলমান রাষ্ট্র আছে কিন্তু ইসলামী জীবন ধারার উপর প্রতিষ্ঠিত কোন সমাজ ব্যবস্থা সেখানে নেই। একই কারণে আজ বিশ্বব্যাপী মুসলিম দলনের বহ্নুৎসব চললেও মুসলিম রাষ্ট্রগুলো পরস্পরকে রক্ষা করতে পারছে না। প্রতীচ্যের তথাকথিত গণতন্ত্রী ও সেকিউলার শক্তিগুলো মৌলবাদের ধুয়া তুলে মুসলিম দুনিয়ার উপর ক্রুসেডীয় নির্মমতা চাপিয়ে দেয়ার প্রেক্ষাপটেও মুসলিম নেতৃত্ব নির্বাক ও সম্বিৎহারা হয়ে আছে। মুসলিম দুনিয়ার নেতৃত্ব আজ আধ্যাত্মিক


www.pathagar.com

রুহ থেকে বঞ্চিত, তাই আজ তারা দুনিয়ার অপরাপর শক্তির গলগ্রহে পরিণত হয়েছে। সেই যে ইকবাল বলেছিলেন।

কওমের যারা ওয়ায়েজ, তারা ধার ধারে নাক, সুচিন্তার
বিদ্যুৎ সম তাদের কথায় হয় না এখন আছর আর।
রোসম রয়েছে আযানের বটে, আযানের রূহ বেলাল নাই
ফালসুফা আছে প্রাণহীন পড়ে', আল-গাযালীরে কোথায় পাই।
মসজিদ আজি মর্সিয়া গায়-নামাযী নাহিক' তার ভিতর,
হেজাযীরা ছিল যেমন-তেমন কোথায় মিলিবে ধরার'পর

খুবত কহিছঃ দুনিয়া হইতে বিদায় নিচ্ছে মুসলমান,
প্রশ্ন আমারঃ মুসলিম কোথা সেকি আজো আছে বিদ্যমান?
চলন তোমার খৃস্টানী, আর হিন্দুয়ানী সে তমদ্দুন,
ইহুদীও আজি শরম পাইবে দেখিলে তোমার এ-সব গুণ।
হতে পার তুমি সৈয়দ, মীর্জা, হতে পার তুমি সে আফগান্,
সব কিছু হও, কিন্তু শুধাই ঃ বলত' তুমি কি মুসলমান?
(জওয়াবে শেকওয়া-অনুবাদ, গোলাম মোস্তফা)

ইকবাল তাঁর কাব্য ও দর্শনের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের জড়বাদী জীবন দর্শনের ত্রুটিগুলো উন্মোচন করেছেন এবং ইসলামী জীবন দর্শনকে নির্ভর করে মুসলিম দুনিয়ার মুক্তি ও কল্যাণকামিতার এক অনিবার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। একইভাবে নিজ সমাজের উদ্যোগহীনতা, নিষ্ক্রিয়তা ও পলায়নী মনোবৃত্তির কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন। ধর্ম ব্যবসায়ী মোল্লা ও খানকা প্রেমিক সুফীর অন্ধত্বকেও তিনি সমালোচনার কষাঘাতে জর্জরিত করেছেন। এমনিভাবে তিনি পাশ্চাত্যের চোখ ঝলসানো সভ্যতা ও অন্যদিকে নিজ সমাজের অচলায়তন এ দুইকে বাদ দিয়ে এক প্রতিশ্রুতিশীল জীবন দর্শনের কথা বললেন যা মানুষকে তার ব্যক্তিত্ব ও মানবতাকে বিসর্জন না দিয়ে সমাজের সাথে একান্ত হতে শেখায়। ইকবাল তার ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন বক্তৃতার এক জায়গায় বলেছেন, 'ইসলাম সমস্ত জড়বস্তুর বন্ধন ও গোলামীর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। ইসলামে জাতীয়তার ভিত্তি একটি খাঁটি ও পবিত্র পরিকল্পনার উপর স্থাপিত। ইসলাম এমন এক মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করতে চায় যাদের মধ্যে বর্ধিত ও সম্প্রসারিত হবার পূর্ণ উপযোগিতা স্বাভাবিক ভাবেই বিদ্যমান। ইসলামে জাতীয়তার ধারণা জাতি সম্পর্কিত অন্য সকল মতাদর্শ হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর মূল আদর্শ ও ভিত্তি ভাষার ঐক্য নয়, বাসস্থানের ঐক্য নয়, বরং মূল নিয়ম হচ্ছে নিখিল সৃষ্টি জগত সম্পর্কে মত ও বিশ্বাসের ঐক্য ও সামঞ্জস্য-যা সব মানুষকে এক অবিচ্ছেদ্য শাশ্বত ঐক্য সূত্রে গ্রথিত করে দিতে সক্ষম। এ মতালম্বী ব্যক্তি আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো, বীর আরব বেদুঈন, গংগার তীরভূমির অধিবাসী আর্য অথবা পামীরের উচ্চতর পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী যেই হোক না কেন, তাদের মধ্যে কোনই পার্থক্য করে না। দেশ ও মাটির পার্থক্য তাদেরকে আচ্ছন্ন করে রাখতে পারে না, কোনো বস্তুতান্ত্রিক ও ভৌগলিক সীমারেখার বৈষম্য তাদের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর রচনা করতে পারে না এবং কোন বংশ বা ভাষার বিরোধও তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না।'



www.pathagar.com

ইকবাল যে আদর্শের কথা বলেছেন তার মধ্যে দেশ, কাল ও ভৌগলিক সীমানার কোন স্থান নেই। ইকবাল চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন উগ্র জাতীয়তাবাদ ইউরোপকে কেমন করে বর্বরতা, অহমিকা ও নাস্তিকতার দিকে ঠেলে দিয়েছে এবং পৃথিবীকে নানাভাবে খণ্ড বিখণ্ড করে তাতে আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে এই সাদা চামড়ার মানুষেরা।

মুসলমান জনপদে এই জাতীয়তাবাদের বিষ যাতে আর অনুপ্রবেশ না করতে পারে ইকবাল তার সম্পর্কে সেকালেই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। কেননা তার চোখের সামনেই ঘটেছিল তুর্কী খেলাফতের দুঃখজনক পরিসমাপ্তি। কিভাবে জাতীয়তাবাদের বিষ মুসলমানের আধ্যাত্মিক ঐক্যকে সেদিন চূর্ণ করে দিয়েছিল, ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের উস্কানী কিভাবে হেজাযের শরীফ হোসাইনকে তুর্কী খেলাফতের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে উৎসাহিত করেছিল এগুলোর সাক্ষী ইকবাল। যার পরিণতিতে আজকের মধ্যপ্রাচ্য খণ্ডবিখণ্ড হয়ে কয়েকটি জাতি ও ভৌগলিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। এর অবশ্যম্ভাবী ফসল হচ্ছে এখন এ দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সদ্ভাব বলতে আর কিছু মাত্র অবশিষ্ট নেই।

এমনকি ইকবাল যে মুসলিম আবাসভূমির ইঙ্গিত তার জীবদ্দশায় দিয়ে গিয়েছিলেন যার পরিণতিতে পাকিস্তানের অভ্যুদয় ঘটেছিল তাও কিন্তু তার পরিকল্পিত মিল্লাতের ধারণার মধ্যে বিকাশ লাভ করতে পারেনি। রাজনৈতিক নেতৃত্বের অদূরদর্শিতা, নীতিহীনতা ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বের ফাঁক গলিয়ে ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং রক্তক্ষয়ের মধ্যে দেশটির ভাঙন চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। এভাবে ইকবালের কল্পনায় জাতীয়তাবাদের সমূহ বিপদ সম্ভাবনার কথা আমাদের কালে আমাদের ভূখণ্ডে সত্য বলে প্রমাণিত হয়। অন্যদিকে জাতি হিসেবে মুসলমানদের ব্যর্থতা এমনিভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে। ইকবাল পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কেননা তার কাছেঃ গণতন্ত্র হচ্ছে এক ধরনের সরকার যাতে মানুষকে গণনা করা হয়, হয় না তার মূল্য যাচাই করা। অধুনা সর্বত্রই গণতন্ত্রের জয়গান শুনতে পাওয়া যায় এবং এ ব্যাপারে পাশ্চাত্যের দেশগুলো দরিদ্র ও অনুন্নত দেশগুলোতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মহান দায়িত্ব নিয়ে রীতিমত উপদেষ্টার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। কিন্তু এই গণতান্ত্রিক রীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে ইকবাল সন্দেহ পোষণ করে গেছেন। যেখানে নেতৃত্বের গুণাগুণ বিচার করা হয় সংখ্যাতত্ত্বের ভিত্তিতে, যোগ্যতার বিচার যেখানে তাৎপর্যহীন সেখানে কি ভালো ফল আশা করা যায়। গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে নীতিহীন ভ্রষ্টাচারীদের যে বিপুল সমাবেশ ঘটে, রাজনীতিতে অবৈধ প্রভাব খাটিয়ে যেভাবে তারা নির্বাচনী বৈতরণী পার হয়, অন্যপক্ষে সৎ ও অধিকতর দক্ষ লোকের ভাগ্যে জোটে অশেষ লাঞ্ছনা ইকবাল তার দিকেই ইংগিত করে গেছেন।

ইকবাল তাই স্পষ্ট করে বলেছেন রাজনীতি থেকে ধর্মনীতি বাদ দিলে যা থাকে তা হচ্ছে চেঙ্গিসের নীতি। এই চেঙ্গিস খানের চেহারাই আমরা দেখছি এখন কসোভোতে, কিছুদিন আগে দেখেছি বসনিয়ায়। ইকবাল মনে করেন আধুনিক দুনিয়া আজ কতকগুলো নৈতিক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে এবং এসব সমস্যা হচ্ছে সকল দেশের সকল মানুষের সাধারণ সমস্যা। এই নৈতিকতার সংকট মোচনের জন্য ইসলামের নব অভ্যুত্থানকে স্বাগত জানিয়েছেন তিনি। ইকবাল মনে করেন ইসলামের এই নবঅভ্যুত্থানের মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িক তাৎপর্য নেই। কেননা সমস্ত পৃথিবী যেখানে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের



www.pathagar.com

অপেক্ষায় আছে সেখানে মানবীয় ইতিহাসের কোন পরীক্ষিত সত্যকে হাজির করলে অসুবিধা কোথায়। ইকবাল নিজেই তার কৈফিয়ত দিয়েছেন– আমার ফারসী মসনবীগুলোর উদ্দেশ্য ইসলামের পক্ষ সমর্থনের প্রয়াস নয়। আমার লক্ষ্য এক সুষ্ঠুতর এক সামাজিক ব্যবস্থার অনুসন্ধান ও বিশ্বের সামনে এক সর্বজন গ্রাহ্য আদর্শের উপস্থাপন, কিন্তু এই আদর্শ নির্ণয়ের চেষ্টায় ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা ও তার মূল্যকে উপেক্ষা করা এই কারণে আমার জন্য সম্ভবপর নয় যে এর প্রধান লক্ষ্য হলো জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও অর্থনৈতিক মর্যাদার সমস্ত কৃত্রিম ও ক্ষতিকর বিভেদগুলোকে নির্মূল করা।.....

ইসলামী সমাজকে যে আমি আমার প্রচেষ্টার প্রাথমিক শর্ত হিসেবে বেছে নিয়েছি, তা কোন জাতিগত বা ধর্মগত সংস্কারের বশবর্তী হয়ে নয়, বরং সমস্যাটির সম্মুখীন হওয়ার কার্যকর পন্থা হিসেবেই।

ইকবাল চেয়েছিলেন মুসলমানদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি। এ লক্ষ্যে কাজ করতে যেয়েই তিনি ভারতীয় মুসলমান নেতৃত্বকে একটি স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র নির্মাণে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু এটুকুতেই কি তার চাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। তা মোটেই নয়। তিনি চেয়েছিলেন ইসলামী আদর্শের উপর নির্ভর করে এক সুখী সুন্দর কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটাতে। কিন্তু এ পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল মুসলমানের নিষ্ক্রিয়তা ও নির্জীবতা। এর জন্য কবির আক্ষেপ ছিল নিদারুণ। তার সেই ক্ষোভ ও হতাশার অভিব্যক্তি ঘটেছে শেকোয়ার ছন্দবদ্ধ অভিযোগগুলোতে। কিন্তু ইসলামের চিরশক্তিমত্ততায় বিশ্বাসী কবি হতাশার মধ্যেও নতুন আলোর ইশারা খুঁজে পেয়েছেন। তাকে তখন লিখতে হয়েছে জওয়াবে শেকোয়া। এ কাব্যে পথনির্দেশের যে গভীর গ্রাহী উচ্চারণ শোনা যায় তা পতনোন্মুখ মুসলমানের চিত্তকে নাড়া না দিয়ে পারে না। তিনি মুসলমানকে অবলম্বন করতে বলেছেন ইসলামের প্রবহমান সত্য ও কোরআনের প্রবল জীবনী শক্তিকে। ১৯৩০ সালে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বার্ষিক সম্মিলনীতে সভাপতির ভাষণে ইকবাল দাবী করেছিলেন মুসলিম হোমল্যান্ডের, সেই সাথে তিনি একথাও বলেছিলেনঃ

In times of crisis in their history it is not Muslims that saved Islam, on the contrary, it is Islam that saved Muslims- ইতিহাসের সংকট মুহূর্তে মুসলমান ইসলামের ত্রাণকর্তা হয়নি, অন্যপক্ষে ইসলামই রক্ষা করেছে মুসলমানকে।

ইকবাল যে সংকটের কথা উল্লেখ করে সমাধান সূত্র হাজির করেছেন সেই সংকটাবর্ত থেকে আমরা কি আদৌ মুক্ত হতে পেরেছি? এর উত্তর দিতে গেলে কতকগুলো না শব্দ বেরিয়ে আসবে। সংকটের ঘোর অমানিশা এখন আমাদের জীবনকে প্রবল অনিশ্চয়তা ও ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। এর থেকে উদ্ধার পেতে হলে ইসলামী আদর্শের অনুবর্তী হওয়ার প্রয়োজন আজ নিদারুণ হয়ে দেখা দিয়েছে যার কথা ইকবাল বার বার ক্রান্তদর্শীর মত ইঙ্গিত করে গেছেন। সে লক্ষ্যে অগ্রসর হতে হলে আরো চাই বিশ্বমুসলিম ঐক্যবোধ, ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি খেলাফত। ইকবাল যেমন চেয়েছিলেন সাধনায় ও শক্তিমানতায় প্রমত্ত মুসলমানের জয়জয়কার, ন্যায় ও আত্মসম্মানবোধে উজ্জীবিত মুসলমানের পদসঞ্চার সেই প্রার্থনা হোক আজ আমাদেরও। ইকবালের মত আমরাও বলি- 'হে আল্লাহ তুমি মুসলমানকে নিদ্রাহীন চক্ষু ও শ্রান্তিহীন হৃদয় দান করো।'



www.pathagar.com

# ইকবাল সম্পর্কে কয়েকটি কথা

ইকবালের ভাবনার জগতে এ কালে মুসলমানের দৈন্যদশার কথাটা বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। মুসলমানের অধঃপতন ও বিপর্যয়ের বেদনা তার প্রাণে গভীরভাবে বেজেছিল। এ কারণেই তিনি তাদের দুঃখবেদনার উৎসমুখগুলো নিবিড় মমতার সাথে, তাদেরই একজন হয়ে খুঁজে দেখার এবং বুঝবার চেষ্টা করেছেন। এই দার্শনিক কবির কাছে মনে হয়েছিল মুসলমান যেদিন ইসলাম ছেড়ে দিয়েছে, সেই থেকে দুর্ভাগ্য তাদের তাড়া করে ফিরছে। মুসলমানের জীবনে ইসলাম এখন প্রধান কেন্দ্রবিন্দু না হয়ে অন্য কোন পথ ও পাথেয়ের সন্ধানে তারা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। এই শিকড় বিচ্ছিন্নতা ও পল্লবগ্রাহিতা মুসলমানদেরকে আরো বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল করে ফেলছে সন্দেহ নেই। ইকবালের এই বিশিষ্ট চিন্তার সাথে অনেকের মতান্তর হতে পারে এবং সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যে সাহসের বিশুদ্ধতা নিয়ে ইকবাল এ কথাগুলো উচ্চারণ করেছেন তা অবশ্যই ভাবুকজনের ভাববার বিষয়।

ইকবালের বলার মধ্যে কোন অপৌরুষসুলভ দুর্বলতা দৃশ্যমান হয় না, তিনি যা বলেছেন তা এক দার্শনিক যুক্তিতর্ক ও নিবিড় উপলব্ধির সাহায্যে বুঝেই বলেছেন। তাই তিনি যখন ইসলামের শক্তিমত্তার কথা, সৃষ্টিশীলতার কথা বলেন তখন তা একজন সাধারণ মুসলমানের বিশ্বাসের কথাকে তিনি উচ্চারণ করেন না, তিনি ইসলাম সমুদ্রের মধ্যে ডুব দিয়ে একজন যত্নবান ডুবুরীর মতো এর আভ্যন্তরীণ ভাব সম্পদ, শক্তি ও সুষমার নব আবিষ্কার করেন। ইকবালের ব্যাখ্যাত ইসলাম তাই সমর্পনধর্মী নয়, বিকাশধর্মী। ইসলামের চিরশক্তিমত্ততায় বিশ্বাসী কবি তাই ইসলামকে আধুনিক কালে সৃষ্টিশীলতা ও শক্তিমানতার প্রতীকে নতুন ব্যঞ্জনা দেন। ইসলাম বলতে এক নতুন সৌন্দর্য ছবি তার মনোনেত্রে আবির্ভূত হয়, তার মাহাত্ম্যে তিনি একান্ত বিশ্বাসবান। তাঁর এই মতবাদ বুঝতে হলে তাঁর সময় ও পারিপার্শ্বিকতাটাকে একটু বোঝা দরকার। এই শতাব্দীতেই মুসলমানদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। এ শতাব্দীতেই মুসলমানরা ইউরোপীয় শক্তির নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্যের মধ্য দিয়ে এক অবমাননাকর জীবন গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। শুধু রাজনৈতিক আধিপত্যের মধ্যেই উপনিবেশবাদীদের নিয়ন্ত্রণ সীমিত থাকে না, মুসলমানদের মন মানসিকতার উপরও ইউরোপীয় আধিপত্য দৃঢ়মূল হয়ে বসে। পাশ্চাত্য মূল্যবোধের দ্বারা প্রভাবিত কিছু মুসলমান বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদ নিজের ইতিহাস আর ঐতিহ্যের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা শুরু করেন। ইসলামের দুশমনদের মতো করে তারাও বলতে থাকেন আধুনিককালে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রযুক্তিগত সমস্যার কোন সমাধান ইসলাম দিতে পারে না, নবী মোহাম্মদ (স) এর শিক্ষা যুগোপযোগী নয় এবং আধুনিক কালে একটি ইসলামী সমাজ গঠনের চিন্তাও তাই একটা অর্থহীন, অবাস্তব প্রচেষ্টা মাত্র। ইউরোপীয় পণ্ডিতরা যেমন করে বলে থাকেন ধর্মের প্রকৃতি হচ্ছে স্থানু, স্থিতিশীল অন্যপক্ষে যেখানে পৃথিবীর প্রতিটি জিনিসই পরিবর্তনশীল,



www.pathagar.com

পরিবর্তনশীল এ পৃথিবীতে যেখানে নিত্য নতুন সমস্যার জাগরণ ঘটছে, সেখানে শতাব্দী প্রাচীন ধর্মীয় মূল্যবোধ কি করে আধুনিক কালের সমস্যার মোকাবিলা করবে। মুসলিম দেশগুলোর কতিপয় পণ্ডিত আর বুদ্ধিজীবী সেকথারই যেন এখানে প্রতিধ্বনি করেন মাত্র। অবস্থা এমন একটা পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে এইসব পাশ্চাত্য প্রভাবিত মুসলমানেরা ভাবতে শুরু করেছেন যদি চালচলনে পোশাক পরিচ্ছদে তারা ইউরোপীয়দের মত না হন, যদি ইউরোপীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সংস্কৃতিকে তারা অবলম্বন না করেন, যদি ধর্মকে রাজনীতি থেকে পৃথক করে তা শুধু ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ না রাখেন, যদি তারা ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী আদর্শ গ্রহণ না করেন এবং নিজেদেরকে শুধু আরব, আফগান, ইরানী, তুর্কী, ভারতীয়, মালয়ী, নাইজেরীয়, সোমালী, পাকিস্তানী, বাংলাদেশী ইত্যাদি পরিচয়ে তুলে না ধরে মুসলিম হিসেবে এবং মুসলিম উম্মাহর অংশ হিসেবে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করেন তাহলে বোধ হয় তাদের জাত রক্ষা হবে না, ইউরোপীয় প্রভাবিত সমাজে মুসলমানরা একেবারে অপাংক্তের হয়ে পড়বে।

মুসলিম মন মানসিকতার এই উপনিবেশীকরণকে (Colonisation of Muslim mind) ইকবাল তার কালে খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং ভবিষ্যতের মুসলিম উম্মাহর জন্য এর প্রতিক্রিয়াকে সংকটজনক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ ভাবে পাশ্চাত্যের চোখ দিয়ে ইসলামকে বিশ্লেষণ করার বিপদজনক পন্থা সম্বন্ধে ইকবাল বলেছেন এতে জীবনের এক নিয়ামক আদর্শ হিসেবে ইসলামের মূল্য শুধু ক্ষুণ্ন হয় না, মুসলিম সমাজের উপর আপতিত ঝড় ঝঞ্ঝার জন্য যুক্তিহীনভাবে ইসলামকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়।

ধর্ম সম্পর্কে পাশ্চাত্যের মনোভাব গড়ে উঠেছে সেখানকার সমাজে আধুনিক কালে খৃস্টান ধর্মের পরিণতি ও অবস্থান থেকে। এ কথা সত্য ধর্ম হিসেবে খৃস্টীয় বিশ্বাস আজ কতকগুলো মূল্যবোধের নাম মাত্র। ধর্মের যে একটা সামাজিক ভূমিকা আছে, ধর্ম যে সমাজ পরিবর্তন ও জাগরণের বড় রকমের একটা হাতিয়ার হতে পারে এই জীবনী শক্তি খৃস্ট ধর্মের এখন আর অবশিষ্ট নেই। ইকবাল বলেছেন খৃস্টান ধর্ম থেকে পাওয়া পাশ্চাত্যের এই মূল্যবোধ ও ধর্ম বৈরিতা ইসলাম সম্পর্কে খাটে না।

ইসলামকে খৃস্ট ধর্মের মত নীতি সর্বস্ব এক ধর্ম ভাবলে মস্ত বড় একটা ভুল হবে। সমকালীন সমস্যার সমাধান করতে ইসলাম ব্যর্থ এমন ধারণা করলেও সে হবে ইসলাম সম্পর্কে পর্বতপ্রমাণ অজ্ঞতার নামান্তর। ইসলাম যে একটা গতিশীল ধর্ম, যুগ সমস্যার সমাধান যে যুগের কর্মপ্রেরণার আলোকেই সমাধান করতে হবে এবং ইসলামের নিজের মধ্যেই সে প্রেরণার উৎস রয়েছে ইকবাল সে কথা জোরের সাথে বলেছেন–

ইসলামের দৃষ্টিতে, সর্ব প্রকার জীবনের পরম বা চূড়ান্ত আধ্যাত্মিক ভিত্তিটি চিরন্তন এবং তা বৈচিত্র ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে। বাস্তব সত্তা সম্পর্কে এরূপ বোধের ওপর ভিত্তিশীল যে সমাজ তাকে স্থিতি ও গতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতেই হয়।



www.pathagar.com

সামষ্টিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনা করার জন্য সমাজের অবশ্যই শাশ্বত নীতিমালা থাকতে হবে, কেননা নিত্যপরিবর্তনশীল পৃথিবীতে এই শাশ্বত বা অপরিবর্তনীয় নৈতিক ভিত্তিমূলেই আমরা দৃঢ় হয়ে দাঁড়াতে পারি। কিন্তু এইসব চিরন্তন নীতিসূত্রের মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির পরিবর্তনশীলতার যাবতীয় সম্ভাবনার সুযোগ রাখতে হবে। কোরআনের মতে, পরিবর্তনশীলতা হচ্ছে স্রষ্টার মহত্তম একটি নিদর্শন বা গুণ। একে অস্বীকার করার অর্থ, যার প্রকৃতি মূলত গতিশীল তাতে গতিহীনতা আরোপ করা। শাশ্বত নীতিতে দৃঢ়মূল নয় বলেই রাজনীতি ও সমাজবিজ্ঞানে ইউরোপ ব্যর্থতার স্বাক্ষর রাখতে বাধ্য হয়েছে। অপরদিকে চিরন্তনের সঙ্গে পরিবর্তনশীলতার সামঞ্জস্য বিধান করতে পারেনি বলে ইসলাম গত পাঁচশত বছর এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। (ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন)

মুসলমানের সামনে এ শতাব্দীতে ইকবালের চিন্তার চেয়ে এরকম সবলতর ও সুন্দরতর চিন্তা অন্য কেউ হাজির করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। দৃষ্টিমান ইকবালের চিন্তার এই সবলতা শুধু মুসলমানকে প্রত্যয় যোগায়নি, ইউরোপীয় চিন্তার নেতিবাচক দিকগুলো ধরতেও বেশ সাহায্য করেছে। ইকবাল তার কালে যা লক্ষ্য করেছেন এবং এখনও মুসলিম দুনিয়ায় যা চলছে তা হলো একধরনের অনুকারবর্তিতা। এই ইউরোপীয় অনুকারিতা মুসলিম দুনিয়ার ভাগ্যোদয়ের সোপান হতে পারেনি, দিনে দিনে মুসলিম উম্মাহর ভাগ্যাকাশে কালো মেঘই জমা হচ্ছে মাত্র। ইকবাল লক্ষ্য করেছিলেন আত্মিক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের দেউলিয়াপনা এবং সেখানকার কনুজ্যমারিজমের দাপটে ব্যক্তিসত্তার শোচনীয় অবক্ষয়। সারা প্রতীচ্য জুড়ে ইকবাল দেখেছিলেন এক নীতিহীনতা ও নীতি বিসর্জনের মহামারী। প্রতীচ্যের বুদ্ধিবৃত্তিক অর্জন এই নীতিহীনতার চাপে দুর্বলতর হয়ে পড়াই স্বাভাবিক এবং সেই দুর্বলতর পটভূমিতে গড়ে ওঠা ইউরোপীয় সমাজে যে ভোগবাদী প্রবণতা দানবীয় আকার নিয়েছে তা ইউরোপকে করে তুলেছে সাম্রাজ্যবাদী ও আগ্রাসী। ইকবাল তার ইউরোপে অধ্যয়নকালীন সময়েই লক্ষ্য করেছিলেন প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো শুধু নিজেদেরকে নয়, বরঞ্চ বিশ্বমানবের এক বৃহৎ অংশ এবং সাথে সাথে মানব সভ্যতার শাশ্বত মূল্যবোধগুলো বিপর্যস্ত করে তুলবার অপেক্ষায় আছে। ইকবালের এই পর্যবেক্ষণ পর পর ঘটে যাওয়া দুটো ভয়ানক বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে যেমন প্রমাণিত হয়েছে তেমনি সাম্প্রতিককালে পাশ্চাত্যের ধনবাদী দেশগুলো কর্তৃক দরিদ্র ও অনুন্নত দেশগুলোকে আই. এম. এফ. বিশ্বব্যাংক প্রভৃতির মাধ্যমে অনেকটা বাধ্যতামূলকভাবে অর্থনৈতিক শোষণের জালে আটকিয়ে ফেলে কাবু করার মধ্যে ইকবালের সেই দানবীয় পাশ্চাত্যের চেহারাকেই ফুটিয়ে তোলে। ১৯০৭ সালে রচিত এক কবিতায় ইকবাল পাশ্চাত্যের নগরবাসীদের এই বলে হুশিয়ার করেছিলেন যে ভঙ্গুর শাখায় বাঁধা নীড় কখনো স্থায়ী হতে পারে না। এ কথা বলে তিনি বুঝাতে চেয়েছিলেন পাশ্চাত্যের দেশগুলো বৈষয়িক উন্নতির ভিত্তিতে যে জমকালো প্রাসাদরাজি গড়ে তুলেছে, তার নৈতিক সামর্থ অতি অল্প, তাই যে কোন মুহূর্তে তা ভেঙ্গে পড়াও বিচিত্র কিছু নয়–

হে প্রতীচ্যের অধিবাসীরা!
আল্লাহর দুনিয়া একটি বিপনীমাত্র নয়।



www.pathagar.com

যাকে তোমরা খাঁটি মুদ্রা মনে করছো
তা অতি তুচ্ছ মূল্যের বলে প্রমাণিত হবে?
তোমাদের সভ্যতা
নিজ হস্তের খঞ্জর দিয়েই আত্মহত্যা করবে।
ভঙ্গুর শাখায় বাঁধা যে নীড়
তা কখনো নির্ভরযোগ্য হয় না,
স্থায়িত্ব তার ধর্ম নয়।

এ কথা সত্য ইউরোপের বিপুল কর্মযোগ ও কর্ম প্রচেষ্টা ইকবালের চোখ এড়িয়ে যায়নি। ইউরোপের এই কর্মষণা ইকবালকে মুগ্ধ করেছিল এবং এমনকি মুসলমানের জীবনে এই কর্মষণাকে তিনি কার্যকরী করার কথাও ভেবেছিলেন। অবশ্য সেই সাথে ইউরোপের নীতিহীনতার বিভীষিকার দিক থেকে মুসলমানকে মুখ ফিরিয়ে নেবার কথাও তিনি বলেছেন। তাঁর বিশ্বাস জন্মেছিল আধুনিক মানুষের জীবন সমস্যার সমাধান খুঁজে পাবার জন্য একদিকে প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মভাবনা অন্যদিকে প্রতীচ্যের বুদ্ধিবৃত্তি ও বিজ্ঞান সাধনার মধ্যে একটা সমন্বয়মূলক বোঝাপড়া দরকার। এমনকি সমস্যার সমাধান সূত্র হিসেবে নাস্তিক্যবাদী সমাজতন্ত্রী বিশ্বাসকেও তিনি নেড়ে চেড়ে দেখেছিলেন এবং জীবন সমস্যার সমাধানে মার্কসবাদ যে করুণভাবে ব্যর্থ হবে এ ভবিষ্যৎবাণীও তিনি করেছিলেন। সময়ের সংকট উত্তরণের জন্যই তাই তাকে ইসলামী চিন্তার পুনর্গঠনের কথা ভাবতে হয়েছিল এবং ইসলামী ব্যবস্থায় যে মূলানুগত থেকেও গতিশীলতার চর্চা অব্যাহত রাখা যায় জীবনব্যাপী সাধনায় তাই তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। ইকবালের কাছে সংকটের স্বরূপ ফুটে উঠেছে এভাবে–

আধুনিক নাস্তিক্যপুষ্ট সমাজবাদে একটি নবধর্মের উদ্যম আছে এবং এ ব্যাপারে তা উদারতর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু উগ্র হেগেলবাদের আদর্শে যেভাবে এর দার্শনিক ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে, তাতে যে মানসিকতা, শক্তি, উদ্দেশ্য ও মাহাত্ম্য একে সমুন্নত করে তুলতে পারতো তারই বিরুদ্ধে এ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। সকলেই স্বীকার করবেন যে ঘৃণা, সন্দিগ্ধতা, ক্রোধ ইত্যাদি মানবাত্মাকে কলুষিত করে এবং তার অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ রুদ্ধ করে। কিন্তু জাতীয়তাবাদ ও নাস্তিক্য পুষ্ট সমাজবাদের যতই প্রশংসা করুন না কেন, এ কথা অনস্বীকার্য যে এসব গুণাগুণই ওই শ্রেণীর মতবাদের মূল উপজীব্য। মানুষ আজ হতাশার সম্মুখীন। মধ্যযুগীয় আধ্যাত্মরীতি যেমন আজ তাকে কোন আশার বাণী শুনাতে পারছে না, তেমনি আধুনিক জাতীয়তাবাদ বা নাস্তিক্যপুষ্ট সমাজবাদও তার অন্তরে নবতর প্রেরণা যোগাতে অক্ষম হয়েছে। আধুনিক সংস্কৃতির ইতিহাসে আজকের দিন বাস্তবিকই একটি সংকটের দিন। (ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন)

সংকটের গুরুত্ব ইকবাল যথাযথ উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেই উপলব্ধিজাত সিদ্ধান্তে আসার পরই তিনি তার স্বধর্মাবলম্বীদের ডাক দিলেন কোরআনের দিকে, ইসলামের দিকে সত্যিকার আন্তরিকতা নিয়ে ফিরে আসতে-যে কোরআন হলো তাদের জন্য উজ্জ্বল পথ


www.pathagar.com

প্রদর্শক ও যাবতীয় আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতার আকর। তিনি আরও বললেন ইসলামেই আছে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, ব্যক্তির মুক্তি, সত্যিকার গণতন্ত্র আর বুদ্ধিবৃত্তির অগ্নিস্রাব। রাজতন্ত্র, যাজকতন্ত্র আর একনায়কতন্ত্রের স্থান নেই ইসলামে। মুসলমানদের ভুলে, মূর্খতায়, সাহস আর একাগ্রতার অভাবে ইসলামের যে চেহারা আজ দাঁড়িয়েছে, ইসলামের প্রকৃত চেহারা তা নয়। জাতীয়তাবাদ ও গোষ্ঠীবাদ মুসলমান সমাজ দেহকে শত শত টুকরো করে ফেলেছে। মুসলমান আজ জাহেলিয়াতের সংস্কৃতিতে নিমগ্ন। আজ মুসলমান দেশগুলোতে মোনাফেকী, মোসাহেবী, গোড়ামী, দারিদ্র সবচেয়ে বেশি ছেয়ে আছে। মুসলমান নেতৃত্ব আজ তাদের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্য সাম্রাজ্যবাদ নির্ধারিত প্যাকেজ ইসলামের চর্চা করছে। এটা করার অর্থই হলো আল্লাহর তৌহীদকে অস্বীকার করা এবং আধুনিকতার নামে একধরনের পরাধীনতাকে বরণ করা। মুসলমানরা আল্লাহ ছাড়া আর কোন শক্তির কাছে মাথানত করবে না-এ সত্যটি ভুলে গেছে বলেই মুসলমানদের এই দশা। এই তিমির শৃঙ্খল ভেঙ্গে বেরিয়ে আসবার কথাই এ কালে ইকবাল উদাত্ত স্বরে বলেছেন। তাহলেই ইসলাম অনুসারীদের আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবী পুনরায় সমুন্নত হবে, তারাও আবার জগজ্জয়ী আসন ফিরে পাবে। ইকবাল তার জওয়াবে শেকোয়ায় আল্লাহর জবানীতে বলছেন মুসলমান যদি আবার ইসলামকে অবলম্বন করে তাহলেই তাদের ভাগ্যাকাশে অরুণোদয়ের সম্ভাবনা সূচিত হবে–

জ্ঞানের বর্ম দিয়েছি তোমারে প্রেম তব তরবারি,
মোর দরবেশ লহ খিলাফত, -হও সুযোগ্য তারি।
আগুনের মত প্রোজ্জ্বল হয়ে জাগবে ও তকবীর,
হও মুসলিম, তদবীর তব জানি হবে তকদীর;
তুমি যদি হও মুহম্মদের প্রেমিক, আমিও তবে
তোমার প্রেমিক হবো,
দুনিয়াতো ছোট, লওহ কলমদেব আমি তোমাকেই;
চিরদিন আমি তোমার প্রেমিক রবো।। অনুবাদ-ফররুখ আহমদ।

ইকবালের সেই পথ আজ আমাদের পাথেয় হোক। তাঁর মহৎ বেদনা সার্থকতার সঙ্গম সাগরে গিয়ে মিলুক।



www.pathagar.com

# মদীনা সনদ

প্রখ্যাত লেখক মন্টোগোমারী ওয়াট মদীনা সনদকে Constitution of Medina বলে উল্লেখ করেছেন। অনেকে এটাকে মধ্যযুগে ইউরোপে সাক্ষরিত ম্যাগনাকার্টা চুক্তির সাথে প্রতি তুলনা করেছেন। মদীনা সনদে সাক্ষরিত পক্ষগুলোর জন্য যে মানবিক অধিকার সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছিল হয়তো তার কথা বিবেচনা করেই ম্যাগনাকার্টার কথাটা উঠেছে। সে যাই হোক না কেন এই সনদের পথ ধরেই রসূল (স) প্রথমবারের মতো মদীনায় একটা আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তনের কথা ভেবেছিলেন। সেদিকটা বিবেচনায় আনলে ইসলামের ইতিহাসে মদীনা সনদের তাৎপর্য অপরিসীম বলা যায়।

মদীনা সনদকে কিতাব-উর-রসূল অর্থাৎ রসূল (স) এর দলিল হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে। এ ধরনের উদ্ধৃতি আমরা রসূল (স) এর প্রাথমিক জীবনীকার ইবনে ইসহাক ও ইবনে হিশামের বইতে দেখতে পাই। প্রকৃত পক্ষে রসূল (স) এর বলিষ্ঠ উদ্যোগ ও কর্মতৎপরতার মুখেই এ দলিল প্রণয়ন করা হয়েছিল এবং মদীনার সকল গোত্রকে এ দলিলের আওতাধীনে এনে একটা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তুলবার প্রাথমিক ভিত্তি নির্মিত হয়েছিল। রসূল (স) এর হিজরতের কালে মদীনার আবস্থা আরবের অন্যান্য এলাকার চেয়ে ভিন্নতর কিছু ছিল না। মারামারি, হানাহানির এক নৈরাজ্যিক পটভূমিতেই তিনি মদীনায় আগমন করেন। মক্কার দিক থেকে শুধু এটুকুই তফাৎ হয়েছিল মদীনার কিছু লোক রসূল (স) এর ডাকে ইসলাম কবুল করেছিল এবং মূলত তাদেরই আহবানে মক্কার কুরাইশদের নির্যাতন ও অবিচারে অতিষ্ঠ হয়ে রসূল (স) মদীনায় হিজরত করেন। মদীনা সনদ সাক্ষরিত হয়েছিল কুরাইশ মুসলিম, মদীনার নও মুসলিম ও মদীনার ইহুদী ও অন্যান্য অধিবাসীদের মধ্যে। রসুল (স) এর হিজরতের পরপরই এ চুক্তি শরীক দলগুলোর মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়। এ চুক্তির ফল হয়েছিল রসূল (স) কে মদীনার সবাই তাৎক্ষণিকভাবে তাদের নবসৃষ্ট রাষ্ট্রের Executive head হিসেবে গ্রহণ করলো। পাশাপাশি মদীনার সকল গোত্র মিলিত হয়ে একটা রাষ্ট্রীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলো যা এতদিন ছিল অনুপস্থিত। রসূল (স) এর মদীনা রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতায় অধিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ইসলামের নবযাত্রা শুরু হলো। এতদিন ইসলামের বাণী প্রচারিত হতো নিভৃতে। মক্কার কুরাইশদের অবিচার আর নির্যাতনে মুসলমানদের পালিয়ে বেড়াতে হতো। ইসলাম এবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মূলকেন্দ্রে চলে আসায় মক্কার অমারজনী অতিক্রম করে মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হলো। এতদিন ইসলাম ছিল ব্যক্তিগত জীবনে, এবার ইসলাম এলো সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ভূমিকা পালন করতে।

নবুয়ত লাভের পর রসূল (স) এর ১৩ বছরের মক্কী জীবনে যে সুরাগুলো তার উপর অবতীর্ণ হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় একটা বিশেষ প্রশ্ন বারবার এখানে আবর্তিত হয়েছে। সেটা হলো আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও মানুষের দাসত্ব এবং মানুষের


www.pathagar.com

পারস্পরিক সম্পর্কের বৈশিষ্ট। উপস্থাপনের ধারা এ সময় বারবার পরিবর্তিত হতে পারে কিন্তু মূল প্রশ্ন একই জায়গায় কেন্দ্রীভূত ছিল। রসূল (স) এর মদীনার জীবনে যে সুরাগুলো অবতীর্ণ হয় তাতে দেখা যায় আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে কেন্দ্র করে কিভাবে একটা সমাজ ব্যবস্থা বিনির্মাণ করা যায় তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। ইসলামের যে বিপ্লবের ধারা তার মূল কথা হলো আল্লাহর আইনসমূহ জীবনের যাবতীয় কার্যাবলী ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রয়োগ করা। রসূল (স) এর হিজরত, কিতাব-উর-রসুল প্রণয়ন এবং পরবর্তীতে ইসলামী রাষ্ট্রের অভিষেকের মধ্য দিয়ে আল্লাহর এই আইন প্রতিষ্ঠার সুযোগ এসেছিল। মক্কী জীবনে যা ছিল বিশ্বাসের বিষয়, মদীনার জীবনে এসে তা হয়ে দাঁড়ালো প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের ব্যাপার।

রসূল (স) এর বাণী তাঁর সমকালে সকল প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস ও ভাবধারাকে আঘাত করেছিল। আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে মেনে নিয়ে তিনি যে সমাজ বিনির্মাণের কথা বলেছিলেন তার অভিষেক হয়েছিল মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে। যেখানে মানুষের অধিকারের কথা বলা হয়েছিল, সাথে সাথে মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব বিলোপ করা হয়েছিল। মানুষের এই মৌলিক সম অধিকারের ধারণা সেকালে মক্কার কুরাইশদের কাছে অদ্ভূত ঠেকেছিল। কারণ সমাজের প্রতিষ্ঠিত সুবিধাভোগীদের ভিত তাতে নড়ে উঠবার সম্ভাবনা ছিল। এ কারণেই রসূল (স) এর উপর কুরাইশরা তাদের প্রভুত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য মারমুখী হয়ে উঠলো এবং তিনি মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য হলেন।

মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে সুদের ধারণা বিলোপ করা হয়েছিল। কারণ সুদ হচ্ছে শোষণের যন্ত্র ও সামাজিক সম্পদ সুষম বন্টনের অন্তরায়। তাই সে পথ তিনি রুদ্ধ করেছিলেন। নারীকে দেয়া হলো ইজ্জত এবং অধিকারের দিক থেকে করা হলো পুরুষের সমকক্ষ। রসূল (স) এর ইসলামী রাষ্ট্রে Gender discrimination এর ঘটনা চিন্তাও করা যেতো না। পাশ্চাত্যের বুদ্ধিবাদীদের কাছে যা আজও দুঃস্বপ্ন মাত্র।

এই বিরাট পরিবর্তন ও মানবিক পূর্ণতা এসেছিল রসূল (স) এর মাধ্যমে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা রূপায়নের পথ ধরে। এই ব্যবস্থা শুধু আরবীয়দের জীবনে পরিবর্তন আনেনি, পরবর্তীকালের ইতিহাসের গতিকেও ঘুরিয়ে দিয়েছিল। মুসলমানরা যে সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল, জ্ঞান, বিজ্ঞান আর দর্শনে যে অপরাজেয় ভূমিকা তারা পালন করেছিল তা এক কথায় বিস্ময়কর। মুসলমানদের এই নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উত্থানের কথা বলতে যেয়ে বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা (পরবর্তীকালে রেডিক্যাল হিউম্যানিস্ট হিসেবে পরিচিত) এম. এন. রায় লিখেছিলেন- The revolt of Islam saved humanity.

মদীনা সনদের কার্যকারিতা বোঝা যাবে ইসলামের এই দ্রোহ ও মুক্তিমন্ত্রের পাশাপাশি ইসলামের সেই ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ভূমিকার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে, যার ফলে মুসলমানরা একটা গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের জনক হতে পেরেছিল।



www.pathagar.com

# মোহাম্মদ আসাদ

পোলিশ বংশোদ্ভূত এক ইহুদী পরিবারে মোহাম্মদ আসাদের জন্ম ১৯০০ সালে। পিতা মাতার দেয়া লিউপোল্ড ওয়েস নামের এই ইহুদী সন্তানটির দ্বিতীয় জন্ম হয় ১৯২৬ সালে যখন তিনি ইসলাম কবুল করেন এবং মোহাম্মদ আসাদ নামে পরিচিত হন। এভাবেই তার বহু পল্লবিত সাধনার রাজপথ অলোক সামান্য দীপ্তিতে বর্ণিল হয়ে ওঠে।

এই ২৬ বছর তার কাটে আকাশচারী জীবনভাবনায়। জীবনের রহস্য খুঁজতে যেয়ে তিনি দেশান্তরী হন। মানুষের মানবিক সম্পর্কগুলো তিনি বার বার খতিয়ে দেখেন। খতিয়ে দেখেন মানুষের উত্থান ও বিপর্যয়ের কার্যকারণ সূত্রগুলো। তার মনের অনন্ত অস্থিরতা চলতে থাকে যতক্ষণ না তিনি ইসলামের মধ্যে স্বস্তি ও স্নিগ্ধতার সন্ধানে পরিতৃপ্ত হন। আসাদের পিতা ছিলেন অস্ট্রিয়া সরকারের একজন মন্ত্রী। তার পিতামহ ছিলেন ইহুদী রাব্বী। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে আসাদ ঘর ছাড়েন এবং অস্ট্রীয় সেনাবাহিনীর পক্ষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ নেন। তখন পোল্যান্ড ছিল অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যের অংশ। যুদ্ধের পর ১৯২২ সালে মোহাম্মদ আসাদ সাংবাদিকতার পেশা বেছে নেন। তখনকার ইউরোপের অন্যতম সেরা পত্রিকা Frank Furter Zeitung তাকে নিকট ও দূরপ্রাচ্যের সংবাদদাতা নিযুক্ত করে। এই সাংবাদিকতার পেশাই তাকে নিয়ে যায় ফিলিস্তিন, ইরান, মিসর, সৌদীআরব আর আফগানিস্তানের জনপদে। মোহাম্মদ আসাদ শুধু পেশাগত দায়িত্ব পালন করেন না, তিনি এখানকার মাটি ও মানুষের কাছে পৌঁছে যান। তাদের জীবনভাবনা, মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক শক্তিগুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্তে আসেন ইউরোপীয় সমাজ ব্যবস্থায় বস্তুতান্ত্রিকতার যে মহামারী চলছে, তার থেকে এরা আশ্চর্যজনকভাবে মুক্ত। আধুনিকতা ও কারিগরী সমৃদ্ধির ছোয়া এদের জীবনে প্রভাব কম ফেললেও মানবিক সম্পর্কের দিকগুলো এখানকার সমাজ সংগঠন ও বিনির্মাণে অত্যন্ত শক্তিশালী নিয়ামক। আসাদ মনে করেন এর জন্য ইসলামের ভূমিকাটাই মূখ্য, যা ইউরোপকে খৃস্টধর্ম দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

মোহাম্মদ আসাদ যখন জেরুসালেম অবস্থান করছিলেন তখনই এখানে শুরু হয়েছিল এ শতাব্দীর সবচেয়ে বিয়োগান্তক ও মর্মস্পর্শী অধ্যায়। বিশ্বশান্তির কুশীলবগুলো কি করে ফিলিস্তিনীদের ভিটে মাটি উচ্ছেদ করে সেখানে অবৈধ ইহুদী রাষ্ট্রের পত্তন ঘটিয়েছিল আসাদ তার একজন প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি সে ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন তার অনবদ্য সৃষ্টি Road to Mecca গ্রন্থে–

I concieved from the outset a strong objection to Zionism ..... I considered it immoral that immigrants, assisted by a great foreign power, should come from abroad with the avowed intention of attaining to majority in Palestine and thus to dispossess the people whose country it had been ..... This attitude of mine was beyond the comprehension of practically all the jews whom I came in contact with during those months. They could not understand what I saw in the Arabs .....


www.pathagar.com

They were not in the least interested in what the Arabs thought; almost none of them took the pains to learn Arabic; and everyone accepted without question the dictum that Palestine was the rightful heritage of the Jews.

বস্তুতঃ পক্ষে মক্কার পথ হচ্ছে আসাদের জীবন ভাবনার মূদঙ্গ; তার সংগ্রামী জীবনের মর্মরিত রক্তলেখা। তিনি তার বিশ্বাসের বাণীকে, অনুভূতির আবহকে এক মহাকাব্যিক মাত্রা দিয়েছেন এ গ্রন্থে। মাধুকরীর ভঙ্গীতে তিনি মধ্যপ্রাচ্যের জনপদগুলো ঘুরে বেড়িয়েছেন। কখনো তাকে দেখা গেছে তুর্কী সুলতানের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে, কখনো তার সন্ধান পাই ইবনে সউদের সফরসঙ্গী হিসেবে। আবার কখনো বা তাকে এক অন্তর্লীন তাপসের ভঙ্গীতে দেখি পারস্যের মরুগিরি অতিক্রম করতে। আরবের ধুলোবালির ওপর দিয়ে তিনি যখন হেঁটে বেড়ান তখন মনে হয় তিনি এক অতিন্দ্রীয় অলৌকিক জগতের উদ্দেশ্যে ধাবমান। মোহাম্মদ আসাদের এই বহুমাত্রিক পরিচয়, তার দিকচক্রবাল আচ্ছন্নকারী মনীষা ও বিশ্বাবিক্ষার স্বাক্ষর হচ্ছে মক্কার পথ। এ বইএর ছত্রে ছত্রে প্রতিধ্বনিত হয়েছে আসাদের মর্মবীণার সুর-কি করে আবার মুসলমানরা তাদের আপন শক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠতে পারবে, বিশ্ব সংসারে মুসলমানরা কি করে আবার তাদের প্রকৃত স্থান খুঁজে পাবে।

বস্তুতপক্ষে মোহাম্মদ আসাদ হচ্ছেন এ কালে মুসলিম মনীষার দিগন্তে ভোরের তারার মতো। ভিন্ন এক পরিমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করেও তিনি মুসলিম জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রাণশক্তিকে উপলব্ধি করেছিলেন এবং এ কারণেই তিনি বর্তমান কালের মুসলিম দুনিয়ার বিপর্যয়ের চিত্র দর্শনে স্থির থাকতে পারেননি। তিনি এর কারণগুলো গভীর দরদ ও আন্তরিকতার সাথে খুঁজে বের করারও চেষ্টা করেছেন।

তিনি তার চোখের সামনে দিয়ে দেখেছেন কিভাবে পশ্চিমী শক্তিগুলো শঠতার নীতি অনুসরণ করে মুসলিম দেশগুলোকে কব্জা করে নিচ্ছে। আর মুসলমানরা সব কিছু দেখে শুনেও ভ্রাতৃবিবাদ ও অন্তহীন কলহের সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, পশ্চিমী সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ বৃত্তি তাদের আত্মমর্যাদাকেও হীনমন্যতার অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে। মোহাম্মদ আসাদ এ কালে ইসলামী সমাজ ও সভ্যতার জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকারক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন মুসলমানদের এই অনুকরণ বৃত্তিকে। তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ Islam at the cross roads এ সে কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন–

The imitation- individually and socially of the western mode of life by Muslims is undoubtedly greatest danger for the existence of Islamic civilization. The origin of this cultural malady dates several decades back and is connected with the despair of Muslims who saw the material power and progress of the west and contrasted it with the deplorable state of their own society.

মুসলমানদের এই হতোদ্যম অবস্থা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে মোহাম্মদ আসাদ এবার তাই অগ্রসর হলেন। তিনি ইসলামের মূল উৎস কোরআনের দিকে হাত বাড়ান। কোরআনের মৌল নীতিকে আত্মস্থ করবার জন্য তিনি এর অধ্যয়ন শুরু করেন। এমনকি কোরআনের শব্দ, শব্দবন্ধ, বাক্য ও উচ্চারণের প্রকৃতি সত্যিকারভাবে আত্মগত করার জন্য তিনি মধ্য ও পূর্ব আরবের বেদুঈনদের সাথে বেশ কিছুদিন চলাফেরা করেন। যাদের ভাষা শৈলী রসূলের যুগের মতোই অপরিবর্তিত



www.pathagar.com

রয়ে গেছে। তার এই কৌশল কোরআনের প্রকৃত পাঠ ও অর্থ উদ্ধারে সহায়ক হয়। আসাদের এই অধ্যয়ন ও অধ্যবসায়ের পথ ধরেই বেরিয়ে আসে এ সময়ের অন্যতম আলোচিত পবিত্র কোরআনের ইংরেজী তরজমা ও তফসীর The message of the Quran. অনারব পাঠকদের কাছে পবিত্র কোরআনের বাণী ও তাৎপর্যের গুরুত্ব বহনকারী এই ইংরেজী তফসীর এক অনির্বচনীয় সুস্বাদ ও অন্তর উপলব্ধির সেতুবন্ধন। বোদ্ধা পাঠকরা এই তফসীরে যেমন খুঁজে পান ভক্ত মনের অন্তর্লীন আবহ তেমনি আধুনিক মনন ও প্রজ্ঞার এক আদিগন্ত শ্যামল প্রান্তর। পবিত্র কোরআনের ইংরেজী তরজমা ও তফসীরের ক্ষেত্রে মোহাম্মদ আসাদের এই বিরলপ্রভা সাফল্য কেবলমাত্র লাহোরের আল্লামা ইউসুফ আলীর সাথেই তুলনীয়। পবিত্র কোরআন অধ্যয়ন করতে যেয়ে মোহাম্মদ আসাদের প্রতীতি জন্মে-ইসলাম জীবনের ধর্ম, জীবনহীনতার প্রশ্রয় এখানে নেই। ইসলাম সমর্থন করে কর্মবাদকে, নাস্তিকতাকে নয়। আত্মা ও শরীরের মধ্যে যেমন ইসলাম কোন বিভাজন স্বীকার করে না তেমনি বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে ইসলামের দৃষ্টিতে কোন মৌলিক তফাৎ নেই। এমনি জীবনধর্মী ও গতিশীল প্রাণের ধর্ম ইসলামের অনুসারীদের বিপর্যয়ের হেতু কি? মোহাম্মদ আসাদ নিজেই তার উত্তর দিয়েছেন-

It was obvious to me that the decline of the Muslims was not due to any shortcomings in Islam but rather to their own failure to live up to it ... It was not Muslims that had made Islam great; it was Islam that had made the Muslims great. But as soon as their faith became habit and ceased to be a programme of life, to be consciously pursued, the creative impulse that underlay their civilization wanted and gradually gave way to indolence, sterility and cultural decay.

মোহাম্মদ আসাদের সাথে দার্শনিক কবি ইকবালের চিন্তার সামঞ্জস্য রয়েছে। একই রকমভাবে ইকবাল যেমন বলেছিলেন,

In times of crisis in their history it is not Muslims that saved Islam on the contrary it is Islam that saved Muslims.

মোহাম্মদ আসাদের সৌভাগ্য হয়েছিল আধুনিক কালের এই শ্রেষ্ঠ মুসলিম দার্শনিক কবির সাথে কাজ করবার। আসাদ দীর্ঘদিন যাবত ভারতীয় উপমহাদেশে অবস্থান করেন। তখনই কবির সাথে তার সখ্যতা গড়ে ওঠে। কবির উপদেশ ও পরামর্শ তিনি দুহাত ভরে গ্রহণ করেছিলেন। ইকবাল মোহাম্মদ আসাদের Islam at the cross roads এর পরিচিতিও লিখে দেন, যাতে তিনি উল্লেখ করেন-

This work is extremely intersting, I have no doubt that coming as it does from a highly cultural European convert to Isalm it will prove an eye opener to own younger generation.

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতে বসেই আসাদ খবর পান তার পিতামাতাকে নাজী সৈনিকরা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে নির্মম নির্যাতনের পর হত্যা করেছে। যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত আসাদ ভারতেই অবস্থান করেন এবং ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি নতুন মুসলিম



www.pathagar.com

রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যোগ দেন। ১৯৫২ সালে আসাদ জাতিসংঘে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। নিউইয়র্কে তার পরিচয় হয় বোস্টোনিয়ার পোলা হামিদার সাথে যাকে তিনি একই বছর জীবন সঙ্গী হিসেবে বেছে নেন। এখানে বসেই তার বহুনন্দিত আত্মজৈবনিক স্মৃতিকথা Road to Meccaর কাজ শুরু করেন। যা কেবল তার প্রথম জীবনের আত্ম আবিষ্কারের উন্মুখর দিনগুলোকেই ধারণ করেনি, এক আধ্যাত্মরসে মিশ্রিত আত্মযোগী পুরুষের প্রবল বিশ্বাসের স্ফুলিঙ্গকে দীপ্যমান করেছে। তিনি তার ইসলাম গ্রহণকে বিবৃত করেছেন এমনিভাবে–

..... home coming of the heart, as I began to understand it during those distant days in the late summer.

নিউইয়র্কে দুবছর অবস্থান করার পরই আসাদ পাকিস্তান ফিরে আসেন। নতুন মুসলিম রাষ্ট্রটির প্রতিষ্ঠালগ্নে যে বিশ্বাস নিয়ে তিনি এখানে এসেছিলেন, পাকিস্তানের রাজনৈতিক অস্থিরতা তার সেই লালিত স্বপ্নকে প্রায় আসম্ভব করে তোলে। তিনি তার উপযোগী পরিবেশ পাবেন না এই ভেবে পাকিস্তান ত্যাগ করেন এবং পুনরায় দেশান্তরী জীবন বেছে নেন। প্রথমে মরক্কো, তারপর তাঞ্জিয়ার্স, সেখান থেকে পর্তুগাল অবশেষে স্পেনে এসে বাসা বাঁধেন আসাদ দম্পতি। ১৯৬১ সালে মোহাম্মদ আসাদ প্রকাশ করেন তার অন্যতম গ্রন্থ The principle of state and Government in Islam. এই গ্রন্থে তিনি পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর উপর ভিত্তি করে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের রূপকল্প হাজির করেছেন। মোহাম্মদ আসাদ দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করেছেন ইসলামী রাষ্ট্রে সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর এবং ঈমানদাররা রাষ্ট্রের সাথে পারস্পরিক সমতা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে যাবতীয় সমস্যার সমাধান ও কার্য সম্পাদন করবে।

আসাদ দেখিয়েছেন এই নীতিমালার ভিত্তিতে আধুনিক কালেও একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের উজ্জীবন সম্ভব। সেখানে মানুষের মৌলিক অধিকার যেমন সংরক্ষিত হবে তেমনি আধুনিক গণতন্ত্রের চেয়েও উত্তম রাষ্ট্রব্যবস্থা নিশ্চিত হবে।

The message of the Quran প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮০ সালে। আসাদ তার এই যুগান্তকারী তফসীর উৎসর্গ করেন এইভাবে যেখানে লেখা হয় People who think. আসাদ আমৃত্যু তার কর্মসাধনা ও সংগ্রাম সবকিছু নিযুক্ত করেছিলেন এই চিন্তাশীলদের জন্য। যাদের মাধ্যমে তিনি আশা করতেন পরিবর্তন ও রূপান্তর। এই একই কারণে আসাদ বারবার ইজতিহাদের কথা বলেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন ইজতিহাদের চর্চার মাধ্যমেই কেবল মুসলিম দুনিয়ার জড়তা ও অচলায়তন ঝেড়ে ফেলা সম্ভব।

আসাদের আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই হলো This law of ours and other Essays, Answers of Islam, calling all Muslims, A vision of Jerujalem. মোহাম্মদ আসাদের মনীষা, প্রবল আদর্শবাদ ও জীবন ভাবনা সর্বোপরি ইসলামের অতি আধুনিক ব্যাখ্যাদাতা হিসেবে তার অসামান্য অবদান আমাদের কালে তার জন্য এক শিখর স্পর্শী ও কালজয়ী স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জ্ঞান ভান্ডার যেমন তিনি আত্মস্থ করেছেন তেমনি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ, ইতিহাস ও সভ্যতার উপরও ছিল তার অসাধারণ পাণ্ডিত্য। তাই তার জন্য মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে ইসলামের চিরন্তন বাণীকে সকলের কাছে পৌছে দিতে কোন বেগ পেতে হয়নি।



www.pathagar.com

# কোরআনে মানুষের মন

মনের গতি যেমন বিপুল ও বৈচিত্র্যময় তেমনি আশ্চর্য সুন্দর ও বিস্ময়কর। শিল্পী ও দার্শনিকেরা মানব মনের এই অপার রহস্য উন্মোচন করতে যেয়ে এ যাবৎ শুধু আকুল বারিধিতে খেই হারিয়েছেন। এমনকি আধুনিক কালের মনোবিশ্লেষকরা পর্যন্ত মনের এই খিল আঁটা দরজা খুলতে পুরোপুরি সফল হয়েছেন এ কথা জোর দিয়ে বলা যাবে না।

মন বলতে ব্যক্তির বিশেষ মানসিক অবস্থাকে বুঝায়। কিন্তু এই মানসিক অবস্থা যেমন দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তু নয় তেমনি বাটখারা দিয়ে মাপার মত কোন সামগ্রীও নয়। এই মানসিক অবস্থাটা মনোবিশ্লেষকরা বিবেচনা করতে চেয়েছেন ব্যক্তির বিশেষ কতকগুলো আচরণ ও মনোদৈহিক প্রকাশভঙ্গীর মাধ্যমে। এ দিক দিয়ে বিবেচনা করতে গেলে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের অন্যতম পথিকৃত সিগমন্ড ফ্রয়েডের কথা উল্লেখ করতে হয়। ফ্রয়েড মনে করতেন ব্যক্তির আচরণ নির্ভর করে দুটি মৌলিক প্রবৃত্তির উপর। একটি হচ্ছে Eros; যার মানে যৌন প্রবৃত্তি। Erosকে ফ্রয়েড life instinct হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অপরটি হচ্ছে Thanatos; যার মানে হচ্ছে ধ্বংস প্রবৃত্তি। ফ্রয়েড যাকে বলেছেন Death instinct. ফ্রয়েডের এই অভিনব চিন্তাভাবনা পরবর্তীকালে বিপুল সমালোচনা ও প্রায় প্রত্যাখ্যানের শিরোপা অর্জন করলেও এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই আধুনিক মনোবিশ্লেষণের ধারাটা মূলত ফ্রয়েডীয় চিন্তার পথ ধরেই উদ্ভূত হয়েছে। ফ্রয়েডের চিন্তাভাবনা সমীকৃত করলে যা দাঁড়ায় তা হলো মানুষকে তিনি কতকগুলো প্রবৃত্তির দাসে পরিণত করেছেন।

মানুষ কি আসলেই কতকগুলো প্রবৃত্তির দাস! মানুষের জীবন কি শুধু অনিয়ম, ধ্বংস আর যৌনানুভূতির মধ্যে সীমাবদ্ধ! ফ্রয়েডের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে কতকগুলো না শব্দ বেরিয়ে আসবে। ফ্রয়েডের কথা মানতে হলে মানুষকে বিবেচনা করতে হয় জৈবিক তাড়নায় প্রণোদিত নিম্নশ্রেণীর কতকগুলো জীব হিসেবে যাদের সামনে উচ্চতর মূল্যবোধ, আত্মসম্মান ও গৌরবগাথা একেবারেই অনুপস্থিত। অস্বীকার করবার উপায় নেই ফ্রয়েডের চিন্তাভাবনার এগুলো হচ্ছে মৌলিক ত্রুটি।

পরবর্তীকালে অবশ্য ফ্রয়েডের চিন্তাভাবনার সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন অনেকেই। এদের মধ্যে মনোবিজ্ঞানী কার্ল ইউং, কার্ল রজারস ও আব্রাহাম মাসলোর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কার্ল ইউং মানুষের মনের স্তরভেদের কথা বলতে যেয়ে জড় ও আধ্যাত্মিক ভাগের কথা বলেছেন। তিনি তাদের সমালোচনাও করেছেন এই বলে, যারা নাকি মানসিক প্রক্রিয়াকে একটি নিছক শারীরবৃত্তীয় প্রতিক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করতে চায়। কার্ল রজারস ও আব্রাহাম মাসলো মানবতাবাদী (Humanistic) মনোবিশ্লেষক হিসেবে পরিচিত। তাদের ধারণা সব মানুষের মধ্যে আছে এক অন্তর্গত শক্তি ও চেতনা যা যথাযথ পরিবেশ পেলেই আত্মবিকাশের পথ খুঁজে পায়।


www.pathagar.com

আধুনিক মনোবিশ্লেষণার এই চিত্রের পাশাপাশি কোরআনী প্রস্তাবনার একটি খসড়া এখন আমরা মিলিয়ে দেখতে পারি।

পবিত্র কোরআনে মানুষের স্থানকে গৌরব ও মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে,

'আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতর অবয়বে।' (সূরা ত্বীন, আয়াত-৪)

সুন্দরতর অবয়ব বলতে বোঝানো হয়েছে, মানুষের দৈহিক অবয়ব ও আকার আকৃতিকে যেমন দুনিয়ার সব প্রাণী অপেক্ষা সুন্দরতম করা হয়েছে তেমনি তার বুদ্ধি ও স্বভাবকেও অন্যান্য সৃষ্ট জীবের তুলনায় উত্তম করা হয়েছে।

অন্যত্র মানুষকে এই পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফার মর্যাদা দানের কথা বলা হয়েছে। (সূরা আল বাক্বারা-আয়াত-৩০)

আধুনিক মনোবিশ্লেষকদের মতো কোরআন মানুষকে শুধু মাত্র প্রবৃত্তির দাসে পরিণত করেনি। উল্টো কোরআনে মানুষকে যেমন দায়িত্বপূর্ণ জীবন যাপনের তাগিদ দেয়া হয়েছে তেমনি মানুষকে পৃথিবীর তাবৎ সৃষ্টির চেয়ে ভিন্নরকমভাবে উপস্থাপনও করা হয়েছে। এই ভিন্নতার কথা বলতে যেয়ে কোরআনে মানুষের অন্তর্গত বৈশিষ্ট্যসমূহ এমনভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যা তার ভিন্নতার দিককেই স্পষ্ট করে তোলে। মানুষের অন্তর্গত রূপ বৈচিত্রের কথা বলতে যেয়ে কোরআনে কতকগুলো শব্দের পৌনোঃপৌনিক ব্যবহার লক্ষ্য করবার মতো। যেমন রুহ, নাফস ও কলব।

মানুষের অন্তর্জগত সম্বন্ধে কোরআনী প্রস্তাবনার সম্যক রূপ বিচার করতে হলে এ সব শব্দের তাৎপর্য নির্ণয় করতে হবে। সূরা হিজর-এ রুহ সম্বন্ধে বলা হয়েছে–

> 'আর আপনার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদেরকে বললেনঃ আমি পচা কর্দম থেকে তৈরী বিশুষ্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্ট একটি মানবজাতির পত্তন করব। অতঃপর যখন তাকে ঠিকঠাক করে নেব এবং তাতে আমার রুহ থেকে ফুঁক দেব, তখন তোমরা তার সামনে সেজদায় পড়ে যেয়ো।' (আয়াতঃ ২৮-২৯)

রুহর প্রকৃতি সম্বন্ধে কাফেররা একবার রসূল (স) কে প্রশ্ন করেছিল। তখন পর্যন্ত এ সম্পর্কে কোন আয়াত নাযিল হয়নি বিধায় রসূল (স) তাৎক্ষণিক উত্তর দানে বিরত থাকেন। তফসীরে ইবনে কাসীরে আছে এরপর ফেরেশতা জিবরাইল রুহ সম্পর্কিত আয়াত নিয়ে অবতরণ করেন। আয়াতটি হলো–

> 'তারা আপনাকে রুহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, বলে দিনঃ রুহ আমার পালনকর্তার আদেশ ঘটিত। এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।' (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত-৮৫)

কোরআনের এই বর্ণনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় রুহ হচ্ছে আল্লাহর এক বিশেষ দান যা মানুষকে আল্লাহর সদৃশগুণাবলীতে বিভূষিত করে। আল্লাহতায়ালা রুহকে নিজের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন এই জন্য যাতে সমগ্র সৃষ্ট জীবের মধ্যে মানবাত্মার শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে ওঠে। রুহর প্রকৃতি সম্বন্ধে বলতে যেয়ে কোরআনের ভাষ্যকার আল্লামা ইউসুফ আলী লিখেছেন– God like knowledge and will. এর তাৎপর্য হচ্ছে, আল্লাহ মানুষকে জ্ঞান



www.pathagar.com

দিয়েছেন, ইচ্ছার প্রবহমানতাকে ধারণ করতে শিখিয়েছেন; যার যথাযথ বিশ্লেষণ ও ব্যবহার মানুষকে অন্য সৃষ্টির উর্ধে স্থান দিয়েছে।

কোরআনের অন্যতম ভাষ্যকার মোহাম্মদ আসাদ রুহ শব্দের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন এমনিভাবে– God's endowing man with life and consciousness. তার মানে হচ্ছে আল্লাহ মানুষকে জীবন দিয়েছেন এবং চেতনার আলোয় অধিষ্ঠিত করেছেন। এটা হচ্ছে মানুষের সেই বিরলপ্রভা অভিজ্ঞতা যা মানুষ তার জৈব ও শারীরবৃত্তীর কাঠামো সম্পূর্ণ হবার পরই অর্জন করে থাকে। রুহ হচ্ছে এমন অভিজ্ঞতা যার দ্বারা মানুষ স্বেচ্ছায় ও স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে জ্ঞান অর্জন, বিশ্লেষণ ও ব্যবহারের যাবতীয় কৌশল আয়ত্ত করে ফেলে। দুনিয়ায় মানুষ হলো আল্লাহর মনোনীত খলিফা। তাই তাকে স্বভাবতই আল্লাহর কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী অর্জন করা চাই এবং সেই গুণাবলীর অন্যতম হচ্ছে নিজের যোগ্যতায় জ্ঞানের যথাযথ আহরণ ও বিশ্লেষণ। সৃষ্টির সূচনালগ্নেই আল্লাহ মানুষের হাতে জ্ঞানের তরবারি তুলে দিয়েছেন এবং মর্যাদার দিক দিয়ে ফেরেশতাদের উর্ধে স্থান দিয়েছেন। কোরআনে এই জ্ঞান দানকে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে–

> 'আর আল্লাহতায়ালা শিখালেন আদমকে সমস্ত বস্তু সামগ্রীর নাম। তারপর সে সমস্ত বস্তু সামগ্রীকে ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। অতঃপর বললেন, আমাকে তোমরা এগুলোর নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্য হয়ে থাক।
> তারা বলল, তুমি পবিত্র! আমরা কোন কিছুই জানি না, তবে তুমি আমাদিগকে শিখিয়েছ (সেগুলো ব্যতীত)। নিশ্চয় তুমিই প্রকৃত জ্ঞান সম্পন্ন, হেকমতওয়ালা।' (সুরা আল বাক্বারা-আয়াত ৩১-৩২)

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় আদমকে কোন সীমিত জ্ঞানের অধিকারী করা হয়নি। উপরন্তু তাঁকে দেয়া হয়েছিল সকল জ্ঞানের সারাৎসার। তিনি আদমকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন এর তাৎপর্য হচ্ছে সীমাহীন জ্ঞানের রাজত্ব আদমের কাঁধে ন্যস্ত করা হয়েছে–

কোরআনে রুহ বলতে শুধু অশেষ জ্ঞানের ভান্ডারকেই বুঝানো হয়নি, মানব চৈতন্যের দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর দ্বারা মানুষের নিজের সম্বন্ধে চেতনা, পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে চেতনা এবং সবশেষে খোদায়ী চেতনার কথা বলা হয়েছে। আবার খোদায়ী চেতনা সম্বন্ধে কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।

> 'আর যখন তোমার পালনকর্তা বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করলেন তাদের সন্তানদেরকে এবং নিজের উপর তাদেরকে প্রতিজ্ঞা করালেন 'আমি কি তোমাদের পালন কর্তা নই? তারা বলল, 'অবশ্যই আমরা অঙ্গীকার করছি।' আবার না কেয়ামতের দিন বলতে শুরু কর যে, এ বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না।' (সুরা আল আ'রাফ, আয়াত ১৭২)

কোরআনে রুহ শব্দের মতো নাফসেরও উল্লেখ রয়েছে। নাফসের বিকাশ ও উন্নতিকে কোরআনে তিনটি স্তরে দেখানো হয়েছে। মানব ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য এই তিনটি স্তরের সময়ানুক্রমিক উত্তরণ খুবই প্রয়োজন। এই উত্তরণ প্রক্রিয়ায় যদি কোন ব্যাঘাত ঘটে তবে ব্যক্তিত্বের বিকাশ বিঘ্নিত হবে। এগুলো হচ্ছে–


www.pathagar.com

১। আল নাফস আল আম্মারাহ বি আল সু
২। আল নাফস আল লাওয়ামাহ
৩। আল নাফস আল মুতমাইন্নাহ

'আল নাফস আল আম্মারাহ বি আল সু'স্তরে মানুষের চেতনা কেন্দ্রগুলো স্তব্ধ হয়ে যায়। কোরআনের বিভিন্ন স্থানে এ স্তরের সীমাবদ্ধতাকে উপমা ও প্রতীকের সাহায্যে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন–

'তাদের অন্তর রয়েছে, তার দ্বারা বিবেচনা করে না,
তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না,
আর তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না।
তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত,
বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর।
তারাই হল গাফেল, শৈথিল্য পরায়ন।' (সুরা আল আ'রাফ, আয়াত ১৭৯)

এ স্তরের নাফস মানুষকে পাপের দিকে আমন্ত্রণ জানায়, মানুষের খারাপ ইচ্ছা ও স্বভাবগুলো এ স্তরে জেগে ওঠে এবং অসৎবৃত্তিগুলো মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। কোরআনে এ স্তরের মানুষের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে– উপেক্ষা ভরে কোরআনের হুশিয়ারীকে তারা প্রত্যাখ্যান করে, তারা হলো গাফেল, অবহেলা প্রদর্শনকারী এবং নির্বোধ। এ ধরনের নাফসকে নিম্নশ্রেণীর হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় স্তরের নাফস হচ্ছে আল নাফস 'আল লাওয়ামাহ'। এ স্তরে উঠে মানুষ নিরন্তর আত্মসমালোচনা করে, ভালো ও মন্দের তফাৎ নিরূপণ করে এবং খারাপ ইচ্ছার বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম করে। এ স্তরেই মানবীয় বিবেক কার্যক্ষম হয় এবং যুক্তি ও বুদ্ধির প্রয়োগ ও ব্যবহার হয়ে থাকে। এই যে অবিরত সচেতনতা ও সংগ্রামমানতা, যা মানুষকে নিয়ে যায় উর্ধতন নাফসের প্রবেশ দ্বারে। একেই বলা হয় 'আল নাফস আল মুতমাইন্নাহ'। কোরআনে এই স্তর সম্বন্ধে বলা হয়েছে প্রশান্ত আত্মা; যে ফিরে যায় আল্লাহর অনন্ত আশীবাদের কোলে। যে আত্মা সর্বপ্রকার আত্মপীড়ন ও রিপুর তাড়না থেকে মুক্ত।

ইমাম গাজ্জালী নাফসের কথা বলতে যেয়ে এর দুটো অংশের কথা বলেছেন। এক অংশের গতি হচ্ছে উর্ধমূখী যা রুহের সাথে মিলিত হয়। অপর অংশ অধঃমূখী যার ঠিকানা হচ্ছে শরীর যা মানুষের আবেগ ও ইন্দ্রিয়ের সাথে জড়িত।

নাফস আল মুতমাইন্নাহর যে স্তরে প্রশান্ত আত্মা বিরাজ করতে থাকে সুফী পরিভাষায় সেই অবস্থানকেই বলা হয় কলব বা হৃদয়। এ অবস্থায় কলব মানুষের মনের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে এবং সকল অতিন্দ্রীয় অভিজ্ঞতা ও শক্তিকে মানবীয় অভিজ্ঞতা ও শক্তিতে রূপান্তরিত করে। কলবের মাধ্যমেই মানুষ বস্তুর অর্থ ও তাৎপর্য উপলব্ধি করে এবং তুলনামূলক বিচার ও সত্যাসত্য নির্ণয় করতে পারে। কোরআনে কলবের কথা এসেছে মানুষের ইন্দ্রিয় চেতনার প্রসঙ্গে এবং বলা হয়েছে কলব যা করে তা হচ্ছে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের উচ্চতর উপলব্ধি (Higher perception)।



www.pathagar.com

যদি কোনভাবে কলবের কার্যকারিতা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে ইন্দ্রিয় চেতনাও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এই ইন্দ্রিয় চেতনা বিহীন মানুষের অবস্থা কি হয় তার আভাস সুরা আল আ'রাফের উপরোদ্ধৃত আয়াতে দেয়া হয়েছে। যারা আল্লাহর বাণীকে অস্বীকার করে কোরআনের ভাষায় তাদের চোখ ও কান খোলা থাকে ঠিকই কিন্তু তাদের কলব বা হৃদয় অন্ধ ও বধির হয়ে যায়। কোরআনের প্রশ্ন হলো যদি তাদের উপলব্ধি ও সত্যাসত্যের বিচারের মাত্রা ঠিকই থাকে তবে কেন তারা পৃথিবীজুড়ে আল্লাহর নিদর্শনসমূহ পর্যবেক্ষণ করে না। যদিও আপাত বিচারে তাদের যুক্তি ও চেতনার ধার অত্যন্ত প্রখর মনে হয়। কিন্তু গভীরভাবে বিবেচনায় আনলে স্পষ্ট হয় সেগুলো আসলে মৃতবৎ যা মানুষকে পশুতে পরিণত করে।

কোরআনের বিবেচনায় আল্লাহ যে কলব বা হৃদয় সৃষ্টি করেছেন তা প্রাথমিকভাবে সকল কলুষতার উর্ধে থাকে। যদি কেউ কোন পাপে আসক্ত হয়ে পড়ে তবে সেই হৃদয়ে মরিচা বা দাগ পড়তে থাকে। কিন্তু মানুষ যদি তার কৃত অপরাধের জন্য আল্লাহর কাছে তওবা করে তবে সেই দাগ মোচন হয়ে যায়। কিন্তু কেউ যদি তওবা না করে তবে সেই দাগ গভীর থেকে গভীরতর হয়ে ওঠে যতক্ষণ না কলবের সকল দরজা বন্ধ হয়ে যায় এবং সবশেষে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক মৃত্যু (Spiritual death) ঘটে। কোরআনে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–

> ১। 'কখনও না, বরং তারা যা করে, তাই তাদের হৃদয়ে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে।' (সুরা আত-তাতফীফ, আয়াত-১৪)
>
> ২। 'এটা এজন্য যে, তারা বিশ্বাস কারার পর পুনরায় কাফের হয়েছে। ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। অতএব তারা বুঝে না।' (সুরা মুনাফিকুন, আয়াত-৩)

মানুষের মনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা বোঝাতেই কোরআনে রুহ, নাফস ও কলবের ব্যবহার হয়েছে। মানুষের অন্তর্জগত সম্বন্ধে কোরআনের এই প্রস্তাবনা মূলত নীতি নির্ভর (Morality based)। অন্য দিকে আধুনিক মনো বিশ্লেষকদের কাছে মানুষের অন্তর্জগত হলো প্রবৃত্তি নির্ভর (instinct based)। মানুষ যা করে তা হচ্ছে প্রবৃত্তির তাড়না প্রসূত। মানুষের আচার আচরণ হলো তার মধ্যে অবদমিত (Repressed) প্রবৃত্তির প্রতিনিয়ত প্রকাশের আকাঙ্খা থেকে উদ্ভূত। অবদমিত প্রবৃত্তি যা সামাজিকভাবে প্রকাশের অনুপযোগী, তা অন্তর্জগতের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য প্রকাশের ভিন্ন পথ খোঁজে যা কিনা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারে। অন্যদিকে কোরআনে মানুষের অন্তর্জগতের প্রবৃত্তিজাত দ্বন্দ্বের চেয়ে নীতি ও নীতিহীনতার দ্বন্দ্বের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মানুষ যদি কোন অপরাধ করে তবে সে অপরাধ বোধ অবদমনের (Repression) প্রক্রিয়ায় বিস্মৃত হতে পারে। কিন্তু সমস্যা থেকে মানুষ মুক্ত হয় না। সেই সমস্যা থেকে উদ্ধার প্রাপ্তির জন্য ইসলামে তওবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। মানুষের অন্তর্জগত সম্বন্ধে কোরআনের এই প্রস্তাবনা অবশ্যই গুরুত্বের সাথে মূল্যায়নের দাবী রাখে।


www.pathagar.com

# গালিব

গালিবের গজল পড়লে মনে হবে এক অনিঃশেষ প্রেমের বার্তা কবি তার রসগ্রাহীদের জন্য তিল তিল করে পরিবেশন করেছেন। গালিব কবিতা লিখেছেন গজল, রুবাই আর কাসিদার আঙ্গিকে। কিন্তু গজলের মাধ্যমেই তার কবিমনের অন্তরঙ্গিতা ও মাধুরী বিপুল বিস্ময় ও বিনম্র সৌরভ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

গালিবকে বলা হয় মুশকিল পছন্দ কবি। কেননা তিনি সহজ প্রকাশে কুণ্ঠিত। দুরূহতা ও একধরনের দুর্নীরিক্ষতার মধ্যে তিনি তার জীবনের বিচিত্রতাকে তুলে ধরেছেন।

উর্দূ গজল এসেছে আরবী-ফারসী ঐতিহ্যের পথ ধরে। এই ঐতিহ্যের সাথে গালিব পুরোপুরি পরিচিত ছিলেন। এমনকি তিনি ফারসীতেই লিখেছেন সবচেয়ে বেশি। এর মধ্যে উর্দূতে যা লিখেছেন তাতেই তিনি হয়ে উঠেছেন এ ভাষার অন্যতম শক্তিমান কবি। গালিব যখন উর্দূ কাব্য সাধনা করেছেন তখন তার হৃদয়ের গভীরে পারসিক ভাষার গুঞ্জনই শোনা গেছে। গালিবের উর্দূ কবিতার শব্দ বিন্যাস ও শব্দ যোজনা পারসিক ভাষার প্রভাবপুষ্ট। পারসিক কবিতার বাক্যবিন্যাসে যে ধরনের জটিলতা আছে গালিব তার পুরোপুরি অনুসরণ করেছেন বলতে হবে। নিজের কবিতা সম্বন্ধে গালিব বলেছেন–

> গালিব! সহজ কথা আমার মনকে ভোলাতে পারে না
> আমার জন্যে জটিল বাক-বন্ধনের দুর্লভ গরিমা আনো।

গালিবের কদর তার প্রেমের গজলগুলোর জন্য। উর্দূ কবিতায় প্রেমের চারিত্রিক-বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। উর্দূ কাব্যে প্রকৃতি প্রেম প্রায় অনুপস্থিত। নারীপ্রেম অত্যন্ত স্পষ্ট। উর্দূতে কবিরা প্রেম নিবেদন করেন তওয়ায়েফদের কাছে। তওয়ায়েফ মানে হচ্ছে মুক্ত নারী। সেকালে ভদ্রঘরের কোন মেয়ের সাথে মেলামেশা করা অকল্পনীয় ব্যাপার ছিল। কবিরা তাই হাত বাড়াতেন তওয়ায়েফদের দিকে। তওয়ায়েফদের কোন পরিবার বন্ধন থাকে না। তাদের প্রাণ-ভোমরা হলো মহফিল। এই মহিফিলে আসে পুরুষেরা। তওয়ায়েফরা মহফিল গুলজার করে তাদের নৃত্যভঙ্গীতে, বাচনভঙ্গীতে। তওয়ায়েফরা কোন পুরুষের কাছে প্রেম নিবেদন করে না। উল্টো পুরুষেরাই তাদের কাছে প্রেম নিবেদন করে কোন কিছুর প্রাপ্তির আশা না করে। তাদের একটু হাসি, একটু কটাক্ষতেই প্রেমিক প্রবরেরা খুশী। কখনো কখনো প্রেমাস্পদের তরফ থেকে অবজ্ঞাও আসতে পারে। অবজ্ঞারও তো পাত্র চাই। সে পাত্র আমি; এটুকুতেই সান্ত্বনা। প্রেমাস্পদ তখন অভিহিত হয় জালিম-অত্যাচারী, কাতিল-ঘাতক, কাফির-বিধর্মী ইত্যাদি বিশ্লেষণে। উর্দূ কবিতায় প্রেমের এই চিত্র বিস্তর। উর্দূ কবিতায় প্রেমের এই গণ্ডী সাধারণত কেউ অতিক্রম করে না। এই গণ্ডীবদ্ধতার মধ্যে থেকেও কেউ কেউ নিজের স্বকীয়তা তুলে ধরে এমনকি অসাধারণ ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে। যেমন গালিব। গালিবের প্রকাশভঙ্গী অন্য সকলের চেয়ে অন্যরকম। নিজের সম্পর্কে গালিবের আস্থাও তাই অত্যন্ত বেশী–



www.pathagar.com

দুনিয়ায় ভালো কবি অনেকেই আছেন
কিন্তু লোকে বলে গালিবের বলার ঢংটাই অন্য।

গালিব তার গজলের রাজ্যে যেমন যুবরাজ তেমনি প্রেমের সাম্রাজ্যেও এক শাহানশাহ। গজলের রাজ্যে তিনি হাকিয়েছেন প্রেমের এক আরবী ঘোড়া–

প্রেমের উপর জোর খাটে না গালিব
এ এমন আগুন যা জ্বালতে গেলেও জ্বলে না,
নেভাতে গেলেও নেভে না।

প্রেমের এই শাশ্বত ও বিশ্বজনীন স্বরূপ এর চেয়ে হৃদয়গ্রাহী ও মনোরঞ্জক ভাষায় লেখা যায় কিনা তা বলা দুরূহ। গালিবের আর একটা শেরের দিকে নজর দেয়া যাক–

ভালোবাসায় বাঁচা আর মরার কোনও তফাত নেই।
তাকে দেখেই বাঁচি যে সর্বনাশীর জন্যে প্রাণ যায়।

লক্ষণীয় এখানে সেই গজলের ঐতিহ্যানুসারে মূলে কাফির শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে। যার অনুবাদ হিসেবে নেয়া হয়েছে সর্বনাশী। আসলে কাফির মানে হচ্ছে বিধর্মী। প্রেমের ধর্ম যে মানে না সে কাফির ছাড়া আর কি। মনে পড়বে অষ্টাদশ শতকে উর্দূ কাব্য উজ্জ্বলকারী মীরের কথা। মীর তার কবিতায় কত রকমভাবে এবং কৌশলে, শব্দ, উপমা ও উৎপ্রেক্ষার এক দৃষ্টি নন্দন প্রাসাদ তুলে প্রেমের বিচিত্র রাজ্য সৃষ্টি করেছেন তা দেখা যেতে পারে–

এই পৃথিবীর যত আয়োজন সবইতো প্রেমের জন্য
প্রেমের আকর্ষণেই আকাশ চক্রাকারে ঘুরছে।

মীর অবশ্য মুশকিল পছন্দ কবি ছিলেন না। তার কবিতা একটা সহজ সরল অর্থ সব পাঠকের কাছে বোধগম্য ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয়ে ওঠে। এখানে একটা কথা বলা দরকার, মীর আর গালিবের কবিতায় যেখানে প্রেমের লক্ষ্য অনেকটাই এক এবং সেটা অনেকটা ব্যক্তিগত সেখানে উর্দূর শ্রেষ্ঠতম কবি ইকবালের কবিতায় প্রেমের ব্যঞ্জনাই সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। ইকবালের কবিতায় ইশকের কথাটা এসেছে সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে। ইকবাল ইশককে দেখেছেন খুদীর বিকাশের সহায়ক হিসেবে। যে বিকশিত খুদী মিল্লাতের কল্যাণ ও মঙ্গল নিশ্চিত করবে। এটা অবশ্য ঠিক ইকবালের কবিতায় সমাজ চেতনা যত প্রবল গালিবের কবিতায় তা নেই বললেই চলে।

প্রেমাস্পদের বর্ণনায় উর্দূকাব্যে এক ধরনের অতিরঞ্জন লক্ষণীয়। সেটা অবশ্য প্রেমিকের মানসিক অবস্থাটার সাথে অনেকটা প্রতিতুলনীয়ও বটে। গালিবের কবিতায় প্রেমাস্পদের বর্ণনায় এই বিচিত্র ভঙ্গী ও কৌশল, অতিরঞ্জন ও উনরঞ্জন, অলংকার ও নিরলংকার সব পথই বেছে নেয়া হয়েছে–

তুমি করুণা করে যখন খুশী ডেকে নিয়ো।
আমি তো চলে-যাওয়া সময় নই যে ফিরে আসতে পারব না।



www.pathagar.com

এই উপমাটি এত চোখে পড়ার মতো এবং প্রাণের গভীরে ধাক্কা দেয়ার মতো অথচ এর অলংকারিতা খুব সহজে ধরা যায় না। অন্যত্র–

প্রভু, যদি সে না-ই বোঝে না বুঝল
যদি আমাকে তেমন ভাষা না দাও, তাহলে
তাকে অন্য একটি হৃদয় দাও।

প্রেমিক কবি এখানে বলতে চান আমার কবিতা দিয়ে, শব্দের কারুকাজ দিয়ে তাকে কোনভাবেই বুঝাতে পারছি না। প্রেমাস্পদের মনের গভীরে পৌছানোর জন্য তাহলে প্রভু তাকে এমন একটা হৃদয় দাও যাতে সে আমার আকুলতা ধরতে পারে।

কখনো কখনো প্রেমাস্পদের না পাওয়ার দুঃখবোধও কবিকে বিচলিত করেছে–

আমার ভাগ্যে তো প্রিয়মিলন নেই
জীবন যদি দীর্ঘতর হত তাহলেও সেই একই প্রতীক্ষা।
প্রেমাস্পদের উদাসীনতার অভ্যাসটাও এসেছে গালিবের মধ্যে-
এদিকে আমি শত সহস্র মর্মভেদী আর্তনাদ-
ওদিকে তুমি, আর এক পরমাশ্চর্য না-শোনা।
মীর এই ভাবটা প্রকাশ করেছেন আরও সরলীকৃত ছন্দে-
মর্মপীড়ার কথা শোনাতে গিয়ে আমি যখন কেঁদে ফেললাম
তখন সে বললো, আমি কখনও শুনিনা নিপীড়িতের কাহিনী।

প্রেমাস্পদের প্রতি এই অনুভূতির সোপান বেয়ে গালিব কখনো কখনো খোদাভক্তির দিকেও এগিয়েছিলেন। অবশ্য গালিবের খোদাভক্তির ভিত্তি হলো কোরআন এবং এক আল্লাহ। গালিব বলেন–

আমাদের এই অস্তিত্ব সেই এক সত্তার প্রকাশ
আমরা কোথায় থাকতাম যদি সেই রূপ আত্মদর্শী না হত।

তার এ কবিতা ইসলামের সুফীবাদের মতাদর্শ প্রভাবিত। সুফীবাদের ভাষায় যাকে বলা হয় ইশক-ই-হাকিকী। এর পরবর্তী অবস্থায় সুফী শাস্ত্রে উত্তরণ ঘটে ফানাফিল্লাহ বা বাকাবিল্লাহর দিকে। গালিবের কবিতায় এই আত্মবিসর্জনের ইঙ্গিত না থাকলেও সুফী মতাদর্শপুষ্ট খোদা প্রেমের বিস্তর উচ্চারণ লক্ষ্য করবার মত। সুফী সাধনায় প্রেম যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গালিব তাতে প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারেন। আর তাছাড়া তিনি তো ছিলেন প্রেমের পূজারী কবি। আজীবন তিনি মানুষকে ভালবেসেছেন। ভালবেসেছেন এই পৃথিবীকে। অনেক অপূর্ণ আকাঙ্খা নিয়ে তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন; সে বেদনাও কখনো কখনো তার মনে তীব্র হয়ে বেজেছিল–

ইচ্ছা তো অসংখ্য, কিন্তু তা পূরণ হতে জীবন যায় ফুরিয়ে
অনেক ইচ্ছাই পূরণ হয়েছে, কিন্তু তা সামান্যই।

---

গালিব ও মীরের কবিতাগুলোর অনুবাদ আবু সয়ীদ আইয়ুব ও জ্যোতিভূষণ চাকীর লেখা থেকে নেয়া।



www.pathagar.com

# দিউয়ানে শামস-ই-তাব্রীজ

১.

দিউয়ানে শামস-ই-তাব্রীজের রচয়িতা হলেন পারসিক সুফী কবি মওলানা জালালুদ্দীন রুমীর আধ্যাত্মিক গুরু মওলানা শামসুদ্দীন তাব্রীজ। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা সেরকম নয়। এ দিউয়ান রুমী নিজেই রচনা করেন এবং প্রাচ্য বিশেষজ্ঞ রেনল্ড নিকলসন লিখেছেন, দিউয়ানের রচনা শেষ হওয়ার পূর্বেই শামসুদ্দীন তাব্রীজ ইন্তেকাল করেন। এ কথা সত্য সুফী জগতে তাব্রীজ ও রুমী, এই গুরু শিষ্য এক প্রকাণ্ড স্থান অধিকার করে আছেন এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও বিচ্ছেদের কাহিনী সুফী সাহিত্যে এক অন্তর্লীন প্রেম ও অনুভূতির রসে বাঙময় হয়ে আছে। কিন্তু সাহিত্য রসিকদের কাছে অদ্যাবধি এটা একটা বড় প্রশ্ন হয়ে ঝুলছে কেন এ কাব্যের নামকরণের বেলায় রুমী গুরুর নামের আড়ালে নিজেকে অন্তরালবর্তী করে রাখতে চাইলেন।

সুফীদের কেউ কেউ মনে করেন রুমী শামস-ই-তাব্রীজকে তাখাল্লুস হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তার কবিতায় প্রেমিক আর প্রেমাস্পদের উপমা এসেছে বারবার। প্রেমাস্পদ বলতে সুফীরা সাধারণত অনন্ত স্রষ্টাকেই ইঙ্গিত করে থাকেন। রুমী শামস-ই-তাব্রীজকে হয়ত প্রেমাস্পদ স্রষ্টার রূপক হিসেবে ব্যবহার করেছেন, সুফীরা মনে করেন যার মধ্যে সকল সৃষ্টির নাম যেমন দীপ্তিমান হয়ে ওঠে তেমনি আবার একই সাথে একাকারও হয়ে যায়।

অনেকে আবার পারসী কবিতার দীর্ঘ ঐতিহ্যের ধারা টেনে বলেছেন তাখাল্লুসের ব্যবহার পারসী কবিদের জন্য নতুন কিছু নয়। এর মাধ্যমে কবিরা তাদের কোন শুভানুধ্যায়ীর প্রতি কৃতজ্ঞতা পোষণ করেন কিংবা কোন বিশেষ ঘটনাকে অমরতা দান করেন এমনকি কোন রহস্যময়তাকেও প্রকাশমান করতে তাখাল্লুসের ব্যবহার লক্ষণীয়। শামস-ই-তাব্রীজের সংস্পর্শেই রুমী ইন্দ্রিয়াতীত জগতের খবর পেয়েছিলেন; যে জগতের রহস্যময়তা ও সৌন্দর্য রুমীকে উজ্জীবিত করেছিল। এই উজ্জীবনের বার্তাবাহীকে স্বাভাবিক ভাবেই রুমী তাখাল্লুসের আড়ালে এক নান্দনিক অমরতা দান করেছেন।

রুমীর জন্ম হয়েছিল বলখে। তার পিতা বাহাউদ্দীন ওয়ালদ ছিলেন সেকালের এক শুদ্ধচিত্ত সুফী সাধক ও পণ্ডিত। কিন্তু বলখের শাসনকর্তা মোহাম্মদ কুতুবুদ্দীন খাওয়ারেজম শাহর সাথে তার মত দ্বৈততা তাকে বলখ ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে এবং তিনি পরিবার পরিজন ও অনেক মুরিদানসহ মক্কা শরীফের দিকে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে নিশাপুরে এসে তারা সুফী সাধক ফরিদুদ্দীন আত্তারের সাক্ষাত পান। আত্তার বালক রুমীকে তার বিখ্যাত গ্রন্থ আসরার নামা (রহস্যের গ্রন্থ) উপহার দেন এবং এই বলে পিতার সামনে পুত্রকে আশীর্বাদ করেন-তোমার পুত্র, একদিন পৃথিবীর সকল আল্লাহ প্রেমীদের চিত্তে আকুলতার আগুন জ্বালিয়ে দেবে। বাহাউদ্দীন ওয়ালদ নিশাপুর থেকে বাগদাদ যান। সেখানে বসেই চেঙ্গিস খান কর্তৃক বলখের ধ্বংসযজ্ঞের কথা শোনেন। তারপরে বাহাউদ্দীন আর তার পরিবার মক্কায় এসে হজ্ব পালন করেন। অবশেষে নানা দেশ আর জনপদ ঘুরে তারা এশিয়া মাইনরে (কুনিয়া) এসে হাজির হন। সেখানে সেলজুক সম্রাট আলাউদ্দীন কায়কোবাদ তাদেরকে সাদরে গ্রহণ করেন।



www.pathagar.com

পিতার ইন্তেকালের পর কুনিয়ায় বসেই রুমী তার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন এবং নানা দেশ থেকে আগত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে জ্ঞান বিতরণ করতে থাকেন। এই কুনিয়ায় বসেই রুমী শামস-ই- তাব্রীজের সাক্ষাত পান এবং এইভাবে তাঁর জীবনে অভূতপূর্ব এক রূপান্তর ঘটে যায়। তখন তার বয়স ৬২। শামস-ই-তাব্রীজের সাথে প্রথম সাক্ষাতের অনুভূতিকে রুমী তার দিউয়ানে উল্লেখ করেছেন এমনি ভাবে–

> Forty years did Reason plunge me in care;
> At three score and two I was made a prey and eschewed
> (worldly) meditation.

২.

শামস-ই-তাব্রীজ সম্বন্ধে জীবনীকাররা প্রায় নীরব। তার জন্ম ও বংশ পরিচয় নিয়েও রয়েছে বিস্তর মতান্তর। কারো মতে তার পিতা খাওয়ান্দ আলাউদ্দীন ছিলেন হাসান সাব্বাহর বংশধর। আলাউদ্দীন তার পৈত্রিক ইসমাইলিয়া মতবাদ পরিত্যাগ করেন, তাদের বইপত্র জ্বালিয়ে দেন এবং ইসলামের প্রকৃত রূপ প্রচারে ব্রতী হন। এরপর আলাউদ্দীন পুত্র শামসুদ্দীনকে উচ্চ শিক্ষার জন্য তাব্রীজে প্রেরণ করেন।

অন্যদের মতে শামসুদ্দীন তাব্রীজেই জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন কাপড় ব্যবসায়ী। শামসুদ্দীন বাবা কামাল জুনদী, আবুবকর সিলা বা-ফ এবং রুকুনউদ্দীন সানজাসী প্রমুখের তত্ত্বাবধানে শিক্ষালাভ করেন। শামসুদ্দীন ছিলেন উৎসাহী পরিব্রাজক; এই কারণে সবাই তাকে পারান্দা (The Flier-উড়ক্কু) নামে অভিহিত করে থাকে। তার চরিত্র ছিল অদ্ভুত, দুর্নীরিক্ষ রহস্যময়। তিনি অত্যন্ত কর্কশ ভাষায় উপদেশ দিতেন এবং তার বুদ্ধিমান শ্রোতাদেরকে গাধা ও ষাঁড়ের সাথে প্রতিতুলনা করতেও দ্বিধা করতেন না। এসব কথা বিবেচনা করেই ডঃ সেপ্রঙ্গার তাকে a most disgusting cynic (বিরক্তিকর হতাশাবাদী) হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এই রহস্যাবৃত সাধক সব সময় এক দীর্ঘ কালো পোষাকে নিজেকে আচ্ছন্ন রাখতেন। একই সাথে নিজের চতুর্দিকে এক রহস্যময়তার পরিবেশও সৃষ্টি করে চলতেন।

কুনিয়ায় যখন শামস-ই-তাব্রীজ হাজির হন রুমী তখন খ্যাতির মধ্যগগনে। তাদের পারস্পরিক সাক্ষাত ও সখ্যের সূচনাটাও চিত্তাকর্ষক। রুমী তখন মাদ্রাসার প্রাঙ্গণে বসে জ্ঞানানুশীলন করছিলেন, অদূরে মলিন বেশ শামস-ই-তাব্রীজ কৌতূহল ভরে তাই নিরীক্ষণ করে চলেছিলেন। অকস্মাৎ কোন কিছু বুঝবার আগেই রুমীর হাতে ধরা মূল্যবান বই টান মেরে শামস-ই-তাব্রীজ নিকটস্থিত এক কূপে ফেলে দেন। স্বাভাবিকভাবেই রুমী-এতে ক্ষুব্ধ হন। শামস-ই-তাব্রীজ জানতে চান এতে এমনকি আছে। রুমী রাগত স্বরে উত্তর করেন তোমার মতো পাগল এটা বুঝবে না। শামস-ই-তাব্রীজ তখন সেই অত্যাশ্চর্য ঘটনাটিই ঘটান যার জন্য রুমী হয়ত এতকাল অপেক্ষা করেছিলেন। তিনি দ্রুত কূপের কাছে যেয়ে হাত বাড়িয়ে পানির তলদেশ থেকে অক্ষত অবস্থায় বই তুলে নিয়ে আসেন। রুমী দেখতে পান বইয়ে একফোটা পানির স্পর্শ লাগেনি। বিস্ময়াবিভূত রুমী তখন জিজ্ঞাসা করেন এটা কি করে সম্ভব। শামস-ই-তাব্রীজ উত্তর করেন এটা মারফতি, এটাও তুমি বুঝবে না।


www.pathagar.com

এভাবেই রুমীর চৈতন্যোদয় ঘটে, তিনি বুঝতে পারেন শামস-ই-তাব্রীজ কোন সাধারণ মানুষ নন। তার হাতে রয়েছে অতিন্দ্রীয় জগতের হাতিয়ার। রুমী তার কাছে ছুটে যান এবং শিষ্যত্ব কামনা করেন। আফলাকী লিখেছেন শামসুদ্দীন রুমীর কাছ থেকে এমন আনুগত্য আশা করেন যা একজন বাদশাহর পক্ষ থেকে তার ক্রীতদাসের কাছেই আশা করা সম্ভব। এই নিঃশর্ত আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রুমী শামসুদ্দীনকে উস্তাদ বলে স্বীকার করে নেন। রুমীর জীবনীকার রিজা কুলি লিখেছেন এ সময় রুমী এমন ভাবে পরিবর্তিত হয়ে যান যে তাকে প্রায় উন্মাদ মনে হতে থাকে। তিনি শিক্ষার্থীদের পাঠদান থেকে বিরতি দেন, অধিকাংশ সময় শামসের সাহচর্যে নির্জনতায় অতিবাহিত করেন এবং সুফী সাধনমার্গের বিবিধ তাৎপর্য নিয়ে গভীরগ্রাহী আলোচনায় প্রবুদ্ধ হয়ে ওঠেন।

রুমীর ভক্ত শিক্ষার্থীরা মনে করতে থাকে এই অচেনা আগন্তুক তাদের প্রিয় শিক্ষককে বিভ্রান্ত করছে, তাই তারা শামসের উপর বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে-এবং এক পর্যায়ে তাকে অপমানিত করে। শামস-ই-তাব্রীজ কুনিয়া থেকে পলায়ন করেন।

গুরুর বিচ্ছেদে রুমী হতবিহ্বল হয়ে পড়েন, বেদনার ভার তার বুকের ওপর পাষাণের মত চেপে বসে। নিকলসন লিখেছেন–

He was passionately regretted by Jalal, who bade the musicians chant songs of love and engaged, day and night, in the sama.

দিউয়ানের অধিকাংশ রচনাই এই বিরহের দিনগুলোতে লেখা। গুরুর স্মরণেই পরবর্তীকালে রুমী শোকার্ত পোষাকে আচ্ছন্ন দরবেশের দল সৃষ্টি করেছিলেন, যাদের ঘূর্ণায়মান নাচ (সামা) সুফী জগতে এক প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছিল। সামা মূলত দরবেশী বিহ্বলতা ও উত্তেজনার একটা পর্যায় যেখানে নাচ ও সংগীতের মধ্যে সৃষ্টিকর্তার অনন্ত সৌন্দর্যকে নান্দনিকতায় মূর্ত করে তোলা হয়। দিউয়ানে শামস-ই-তাব্রীজ হচ্ছে রুমীর এই সৌন্দর্য আপ্লুত মনের বৈদগ্ধ ও বৈচিত্রের ছবি।

৩.

সুফীরা সৃষ্টিকর্তাকে এক অনন্ত সৌন্দর্য ও রহস্যময়তার মধ্যে প্রকাশ করেন। আমরা সাধারণ মানুষ সৃষ্টিকর্তাকে যে ভাবে অবলোকন করি সুফীদের বিবেচনা তার থেকে ভিন্ন রকম। আমরা সৃষ্টিকর্তার কাছে অবনত হই, ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং ভীত হই। সুফীরা চর্চা করেন যাবতীয় শুদ্ধতা ও পরিচ্ছন্নতার এবং এই পথ বেয়ে তারা সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য লাভ করেন। এই অবস্থায় তারা বিশ্বাস করেন সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন প্রেমময় ও সৌন্দর্যময়। এই বিশ্ব পৃথিবী তার প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রকাশ। আমরা যারা তারাও এই এক শুদ্ধতা ও প্রেমময়তার বিচিত্র প্রকাশ মাত্র। এ ভাবেই সুফীরা বৈচিত্রের মধ্যে এক অন্তর্গত ঐক্যের সন্ধানে আত্মহারা হয়ে ওঠেন। দিউয়ানে রুমী বলছেন–

What was that mass of waters? Nought but the wave.
What was that wave? Nought but the sea.

সুফীর কাছে এই পৃথিবী ক্ষণস্থায়ী এবং সেকারণেই মূল্যহীন। সুফী তাই কোনভাবেই আর এই অনস্তির পিছনে ছুটতে চান না। তার লক্ষ্য নির্দিষ্ট এবং তিনি একমাত্র তার


www.pathagar.com

প্রেমাস্পদকেই চান, যার কাছ থেকে আমরা এসেছি এবং সবকিছুর অস্তিত্বলাভ সম্ভব হয়েছে। সব সুফীদের মতই রুমীর বর্ণনায় এক ধরনের রহস্যময়তা কাজ করেছে। রূপক ও উপমার কুশলী ব্যঞ্জনায় তিনি এই রহস্যময়তার মধ্যেও এক মায়াবী জগতের খবর আমাদের দিয়েছেন। দিউয়ানের একটি কবিতাংশ হচ্ছে এরকম–

Every moment the voice of love is coming from left and right.
We are bound for heaven: who has a mind to sight-seeing?
We have been in heaven, we have been friends of the angels;
Thither, sire, let us return, for that is our country.
We are even higher than heaven and more than the angels;
Why pass we not beyond these twain? Our goal is majesty supreme.

সুফীদের মধ্যে প্রেমাস্পদের বর্ণনায় এক ধরনের প্রতিযোগিতা চলে। কে কতভাবে কত রং, বৈচিত্র ও ভংগীতে প্রেমাস্পদের বর্ণনা দিতে পারে তা এক রীতিমত গবেষণার বিষয়। দিউয়ানে শামস-ই-তাব্রীজের গজলগুলো পড়লে এর সত্যতা প্রতীয়মান হয়ে ওঠে। একটা গজল উদাহরণ হিসেবে নেয়া যাক, প্রেমের মধুরতা এখানে এমন চিত্তহারী ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে তার তুলনা একান্তই বিরল–

No joy have I found in the two worlds apart from thee, Beloved.
Many wonders I have seen: I have not seen a wonder like thee.
.....
O thou who art milk and sugar, O thou who art sun and moon.
O thou who art mother and father, I have known no kin but thee.
O indestructible love, O divine Minstrel.
Thou art both stay and refuge: a name equal to thee I have not found.

সুফীদের জগতে প্রেমের অবিচ্ছেদ্যতা প্রশ্নাতীত। প্রেমের পথেই আসতে পারে মুক্তি সুফীরা সেটা গভীরভাবে বিশ্বাস করেন। এক গভীর প্রেমময়তার মধ্যে আল্লাহ এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং একই সাথে প্রেমময়তার মধ্যে এই পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছেন। তাই আল্লাহর পথই হচ্ছে আমাদের একমাত্র মুক্তিসাধন মন্ত্র এবং সেকথাই রুমী আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেছেন–

Seek sweet syrup in the garden of love,
For Nature is a seller of venegar and a crusher of unripened grapes.
Come to the hospital of your own creator:
No sick man can dispense with that physician.

(ফুটনট হবে) গজলগুলোর ইংরেজী অনুবাদ R.A. Nicholson কৃত selected poems from the Divani Shamsi Tabriz থেকে নেয়া।



www.pathagar.com

# ফাতেহা-ই-দোয়াজ দাহাম

জগতের শ্রেষ্ঠতম মানুষের স্মৃতিবাসরে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের দিনে যে জিনিসটা প্রবলভাবে মনকে পীড়া দেয় তা হলো তার আদর্শের পতাকাবাহীদের দুর্যোগ ও দুর্দৈব লাঞ্ছিত বর্তমান চেহারা। গত কয়েকশ বছর ধরে মুসলমানদের জীবনে যে নিষ্ক্রিয়তা ও নির্বীর্যতা বাসা বেধেছে তার থেকে মুক্তির কোন আশু লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না এবং ফলস্বরূপ মুসলমানরা আর আগের মত জগজ্জয়ী ভূমিকাও রাখতে পারছেনা। রসূল (স) এর অপার সাধনা, বীর্যবন্ত সংগ্রাম ও মুক্তিমন্ত্রের বদৌলতে যে জাতি একদিন বিশ্ব সভ্যতার চালকের আসন গ্রহণ করেছিল, জগতের যত গৌরবময় ভূমিকার পিছনে যাদের বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ত সঞ্চরণশীল ছিল; হতাশা, বিপর্যয় ও দুর্বলতা কেন তাদের জীবনকে আজ গ্রাস করল এ প্রশ্নের উত্তর মুসলিম দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবীরা বেশ কিছুদিন ধরেই খুঁজে ফিরছেন। সাম্রাজ্যবাদের কালে যখন মুসলিম রাষ্ট্রগুলো উপনিবেশবাদীদের করতলগত হয় তখন পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবীরা আমাদের হিতোপদেশ দিয়েছিলেন মুসলমানদের দুর্গতির উৎস ইসলামের অন্তর্গত দুর্বলতার মধ্যেই লুক্কায়িত। সুতরাং মুসলমান বিশ্বকে এগিয়ে যেতে হলে ইসলামকে সরিয়ে রেখে ইউরোপীয় আধুনিকতা ও বুদ্ধিমানতার অনুবর্তী হতে হবে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের নিজেদের মত করে যে চিন্তাভাবনা ও মূল্যবোধ সেদিন মুসলমান দেশগুলোতে অনুপ্রবেশ করিয়ে গিয়েছিল তার প্রভাব এখনও আমাদের রাষ্ট্রনায়ক ও বুদ্ধিজীবীরা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। স্বাভাবিকভাবেই তারা মানসিকভাবে পাশ্চাত্য অনুগত রয়ে গেছেন। যে কারণে পাশ্চাত্যের চোখ দিয়ে যখন তারা ইসলামের আদর্শবাদকে পর্যবেক্ষণ করতে চান তখন তারা নিজেদের মূল আর শিকড় সম্পর্কে এক ধরনের নিস্পৃহ মনোভাব পোষণ করে থাকেন। মুসলিম দুনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদ যে জিনিসটা সফলভাবে করতে সক্ষম হয়েছে তাহলো মুসলিম জাতি আজ বহুখণ্ডে বিভক্ত হয়ে পঞ্চাশটির অধিক জাতি রাষ্ট্রে (Nation staes) পরিণত হয়েছে। এসব খণ্ড খণ্ড দেশগুলোকে তারা আবার পরস্পরের বিরুদ্ধে উস্কে দিতেও সমর্থ হয়েছে। মুসলমানরা আজ পরিচিত হয়েছে তাদের ভৌগলিক রাষ্ট্রের পরিচয়ে। যেমন ইরানী পাকিস্তানী বাংলাদেশী ইত্যাদি। অথচ মুসলমানদের পরিচিতির নির্ণায়ক হচ্ছে তাদের তৌহীদ ভিত্তিক আদর্শ এবং মুসলিম সমাজের সংহতি নির্ভর করে এই আদর্শের অনুশীলনের মাধ্যমে। মুসলমানদের এই আদর্শিক সমাজ, ইকবাল যাকে বলেছিলেন মিল্লাত তা আজ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত বলা যায়। পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদী চেতনাই মুসলমানদের এই আদর্শিক ঐক্যকে দুর্বল করে দিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। যে কারণে এক রাষ্ট্রের মুসলমান ভাই অন্য রাষ্ট্রের মুসলমান ভাইয়ের বিপদে, দুর্যোগে এগিয়ে আসতে পারে না। কেননা তখনই পাশ্চাত্যের নৈতিকতা অনুসারে তাকে এক রাষ্ট্র কর্তৃক অপর রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অথচ এসবের কোন কিছুরই অনুমোদন ইসলামে নেই।

সাম্রাজ্যবাদীরা মুসলমান দেশগুলোকে খণ্ড বিখণ্ড করেই শুধু তৃপ্ত হয়নি, মুসলিম দেশগুলোতে ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে পাশ্চাত্য মূল্যবোধ, ভাবধারা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছে। ফলশ্রুতিতে এমন সব শিক্ষিত মানুষের দল এখানে তৈরী হয়েছে যারা ইসলামী ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার সম্পর্কে যেমন অজ্ঞ তেমনি পাশ্চাত্যের তলপীবাহক হিসেবে তাদের ভূমিকা সীমাবদ্ধ হয়ে আছে।



www.pathagar.com

শিক্ষার পিছনে একটা দর্শন কাজ করে এবং সে দৃষ্টিভংগীর আলোকে শিক্ষার্থীদের মনোবিকাশ ঘটে। বছরের পর বছর ধরে মুসলিম দেশগুলোতে পাশ্চাত্যের এই শিক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকার ফলে শিক্ষার্থীদের অন্তর থেকে ধর্মীয় চৈতন্য শিথিল হয়ে পড়ছে। মুসলমানদের কাছে আল্লাহ ছাড়া কোন বাস্তবতাই চূড়ান্ত নয়। অথচ ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের শিক্ষার্থীদের অন্তরে আল্লাহর সৃষ্টিশীলতা উপলব্ধির বদলে জাতিরূপী দেবতাকে স্থান করে দিচ্ছে এবং এক ধরনের জড়বাদী ভোগবাদকে নিরংকুশ প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। এ সবের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হচ্ছে পাশ্চাত্যের অনুকারবর্তীর দল বৃদ্ধি করে সাম্রাজ্যবাদীরা মুসলমানদের ভিতর থেকেই মুসলমানদের সর্বনাশের আয়োজন শুরু করেছে। যার ফলে মুসলমান নামধারী পাশ্চাত্যের এই তল্পীবাহকরা আজ কোরআন শরীফের বিশুদ্ধতা, মহানবী (স) ও তার সুন্নাহর সত্যতা, শরীয়াহর পরিপূর্ণতা এবং বিশ্বসভ্যতায় মুসলমানদের কালজয়ী অবদানকে সমালোচনার বিষয় বানিয়ে ছেড়েছে।

নিজের ঐতিহ্য, ধর্মবিশ্বাস ও পূর্বসূরীদের আদর্শের উপর একজন ঈমানদার মুসলমানের যে অবিচল আস্থা রয়েছে তাতে সংশয় সৃষ্টি করে তার ইসলামী চেতনাবোধকে দুর্বল করা এবং ইসলামী ব্যক্তিত্বকে কলঙ্কিত করে প্রতিরোধের জন্য যে আধ্যাত্মিক শক্তি দরকার তাতে ভাঙ্গন ধরিয়ে তাকে বশংবদ করাই হলো এসব সমালোচনার উদ্দেশ্য। এ সবের মাধ্যমে মুসলমান দেশগুলোতে যে পাশ্চাত্য মনোবৃত্তি সম্পন্ন শক্তিশালী গোষ্ঠীগুলো তৈরী হচ্ছে তারাই এখন মুসলমান সমাজ সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধ্বংসের বরকন্দাজ হিসেবে মাঠে নেমেছে।

একালে মুসলিম দেশগুলোতে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের সমূহ বিপদ সম্ভাবনার কথা ইকবাল ও মোহাম্মদ আসাদের মত দ্রষ্টা ও বুদ্ধিজীবীরা বেশ জোরের সাথে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন মুসলমানদেরকে পাশ্চাত্য সভ্যতা মুক্তির নির্দেশ করতে পারবে না, তাদের উন্নতি ও প্রগতি নির্ভর করছে ইসলামী শরীয়তের ব্যাপক অনুশীলন ও চর্চার মধ্যে।

পাশ্চাত্যের বিখ্যাত পণ্ডিত জর্জ সার্টন তার Introduction to the history of science গ্রন্থে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন মধ্যযুগে জ্ঞান বিজ্ঞানের মশাল বহন করেছে একমাত্র মুসলমানরা। তাদের অবিচলতা বিশ্বাসের প্রবলতা একদিন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সভ্যতার আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিল। এরকম কথার প্রতিধ্বনি বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত Adam Mez তার The Renaissance of Islam গ্রন্থেও উচ্চারণ করেছেন।

এই যে মুসলমানরা এইভাবে একদিন বিশ্ব পৃথিবীকে শাসন করেছিল, ত্রাণ করেছিল, তার পিছনে কাজ করেছিল তাদের স্বকীয় আদর্শের প্রতি আনুগত্য ও পরম নির্ভরতা। আদর্শের প্রতি বিচ্ছিন্নতা, অসংলগ্নতা আজ তাদেরকে নিক্ষেপ করেছে দুর্যোগ পীড়িত এক বৈরী সময়ের মধ্যে। কালের বহু আবর্জনাপূর্ণ স্রোতধারা সামনে করে আজ আমরা নিশ্চল হয়ে বসে আছি। এই নিশ্চলতার দ্বার ভেঙ্গে আজ আমাদের সার্থকতার সাগর সঙ্গমে নতুন করে পৌছানো দরকার। যেমন করে আমাদের পূর্বসূরীরা বুক পেতে দাঁড়িয়েছিলেন তাদের সমসাময়িককালের দুঃখ ব্যথার মর্মস্থলে, দাঁড়িয়ে সমস্ত জগতের জন্য এক কল্যাণ পথের শুভ যাত্রা করেছিলেন। তাদের এই শুভ যাত্রায় যেমন তাদের কাণ্ডারী ছিলেন হযরত রসূল (স), আজ আমাদের এই দুঃখ দাহন আর পীড়নের দিনেও তিনি আমাদের হাত ধরে পৌছে দেন মঞ্জিলে মকসুদের পানে-এই হোক কামনা। তাঁর প্রতি দরুদ ও সালাম।

বালাগাল উলা বে কামালিহি।
কাশফাদদুজা বে জামালিহি। ...


www.pathagar.com

দান্তে ইসলাম গ্রহণ করেননি। কিন্তু পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত শবে মেরাজের কাহিনী এবং হযরত রসুল (স) এর উর্ধাকাশে গমনের ঘটনাবলীকে তিনি তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ ডিভাইন কমেডির উপজীব্য নির্মাণে ব্যবহার করেছিলেন। শবে মেরাজের কাহিনী থেকে যে তিনি ডিভাইন কমেডির লেখার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন তা এই শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্তও ছিল অপরিজ্ঞাত। মুসলিম ইতিহাসে শবে মেরাজের চিত্তাকর্ষক ঘটনাবলীতে উজ্জীবিত হয়ে যারা সাহিত্য সাধনা করে বিশ্বখ্যাতির অধিকারী হয়েছেন তার মধ্যে মরমী সাহিত্যিক ইবনুল আরাবীর নাম উল্লেখযোগ্য। অনেকে মনে করেন বিশ শতকের মুসলিম তমদ্দুনের তূর্যবাদক কবি ইকবালের জাভিদনামায়ও রয়েছে দান্তের ডিভাইন কমেডির অনুরণন। দান্তে ছিলেন মধ্যযুগে ইতালীর রেনেসাঁর উন্মেষকালের পথিকৃত কবি। রেনেসাঁ যুগের আর একজন দিশারী সহিত্যিক হলেন গিওভানী বোকাচিও।

দান্তের ডিভাইন কমেডিতে ইসলামী ঐতিহ্যের প্রভাবের কথা প্রথম প্রকাশ করেন স্পেনীয় প্রাচ্যতত্ত্ববিদ মিগুয়েল আসিন পিলাকিউস। ১৯১৯ সালে মাদ্রিদে প্রকাশিত তার বিখ্যাত গ্রন্থ Escatalodgia Muselmana ela Comedia Divnaয় দান্তের উপর ইসলামের প্রভাব কতখানি স্পষ্ট ছিল তার বিশদ বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

দান্তের অনুরাগীরা প্রথমে এ কথা মেনে নিতে রাজী হননি। তারা ধারণা করেছিলেন এ কথা সত্য হলে দান্তের প্রতিভা ও মৌলিকত্বের গুরুত্ব অস্বীকার করা হবে।

পিলাকিউস তার গ্রন্থে রসূল (স) এর কাবা শরীফ থেকে জেরুসালেম গমন এবং সেখান থেকে উর্ধাকাশ পরিভ্রমণের ঘটনাবলীর সাথে ডিভাইন কমেডির স্বর্গ, নরক ও অন্তবর্তী স্থলে দান্তের ভ্রমণ ও পর্যবেক্ষণের একটি তুলনামূলক রেখাচিত্র টেনেছেন। পিলাকিউস স্পষ্ট করে বলেছেন উভয় কাহিনীর মধ্যে একটা অন্তর্গত যোগাযোগ ও সংশ্লিষ্টতা আছে যাকে শুধুমাত্র দুর্ঘটনা বা co-incidence হিসেবে উড়িয়ে দেয়া চলে না। এই সংশ্লিষ্টতা শুধু দান্তে বর্ণিত কাহিনীর আঙ্গিক ও প্রকরণকে নির্দিষ্ট করেনি; এই ইসলামী কাহিনী থেকে দান্তে ডিভাইন কমেডির জন্য অনেক দৃশ্য ও উপমা গ্রহণ করেছেন। বিশেষ করে শবে মেরাজের যে নৈতিক উপযোগিতা বর্তমান তা দান্তে গ্রহণ করতে একটুও দ্বিধা করেননি।

অধ্যাপক পিলাকিউসের মত এ্যানজেল গোনজালেজ প্যালেনসিয়া তার History of Andalusian thought গ্রন্থে শবে মেরাজের ঘটনাবলীর সাথে ডিভাইন কমেডির সংশ্লিষ্টতাকে উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। অধ্যাপক পিলাকিউস বলেছেন দান্তে তার জীবদ্দশায় আরবীয় চিন্তা ভাবনা এবং অনেক কথা ও কাহিনীর সাথে পরিচিত হয়েছিলেন। আরবদের সাথে খৃষ্টান ইতালির বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। তাছাড়া ক্রুসেডের মাধ্যমেও খৃষ্টান ইউরোপ বিশেষত ইতালির সাথে আরবদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। এই সব যোগাযোগের কারণে আরবী বই পুস্তক ইতালিতে আসা অসম্ভব কিছু ছিল না। পিলাকিউস মুসলিম সিসিলিকে এই যোগাযোগের ভিত্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন, বিশেষ করে নরমানরা যখন এটি অধিকার করে নেয়। এটা অনেকেরই জানা থাকবার কথা, সিসিলির নরমান রাজদরবারে অনেক মুসলিম, খৃষ্টান ও ইহুদী পণ্ডিত ছিলেন। এরা রাজার উৎসাহে সেকালে বিপুলভাবে আরবী বই পুস্তক ল্যাটিন ভাষায় তরজমা করেছিলেন। এই সূত্রে মুসলিম স্পেনের গৌরবোজ্বল ও বুদ্ধিবৃত্তিক ভূমিকার কথা উল্লেখ করে পিলাকিউস লিখেছেন, টলেডোয় এমন কিছু পণ্ডিত ছিলেন যারা আরবী বই পুস্তক অহর্নিশ ইউরোপীয় ভাষায় তরজমা করেছেন। পাশাপাশি জ্ঞানী আলফোনসের উদ্যোগেও তরজমাকারীদের একটি সংঘ গড়ে উঠেছিল। এ সমস্ত পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত



www.pathagar.com

প্রমাণ করে রসূল (স) এর উর্ধাকাশ গমনের ঘটনাবলী নানা সূত্র থেকে ইতালির বুদ্ধিমান সমাজের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক পিলাকিউস দান্তের শিক্ষক ব্রানেতি ল্যাতিনির কথা বলেছেন যার আরবীয় সংস্কৃতির উপর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তিনি ১২৬০ খৃষ্টাব্দে ক্যাস্টিলির রাজদরবারে গমন করেন। যেখানকার বিজ্ঞ রাজার দরবারে কয়েকজন মুসলিম পণ্ডিত চাকুরীরত ছিলেন। এরা রাজার সহযোগিতায় অনেক আরবী রচনা ল্যাটিন ও স্প্যানিশ ভাষায় তরজমা করেন। এ ছাড়া ডিভাইন কমেডি ও অন্যত্র দান্তের মুসলিম পণ্ডিতদের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভংগী স্পষ্ট। বিশেষ করে আবু মাশার আল ফালাকী আল ফারগানী, আল বাতরুহী, আল ফারাবী, ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ ও আল গাজ্জালীর মত মুসলিম চিন্তাবিদ ও পণ্ডিতদের প্রতি তার শ্রদ্ধার অভাব ছিল না। এমনকি মধ্যযুগে খৃষ্টান জগতের প্রধান শত্রু সুলতান সালাহউদ্দীনের প্রতিও তার লেখায় প্রশংসার উল্লেখ আছে।

বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত এসব দলিলাদির উপর নির্ভর করে অধ্যাপক পিলাকিউসের দান্তের উপর ইসলামের প্রভাবের এই যুগান্তকারী আবিষ্কারকেও ইতালির কিছু সন্দেহ প্রবণ ও রক্ষণশীল বুদ্ধিজীবী খোলা মনে গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। ইতালীয় বুদ্ধিজীবীদের এই দোদুল্যমানতা ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত টিকে ছিল। যখন স্প্যানিশ গবেষক জোসে মুহজ সানডিনে। ক্যাস্টিলিযান, ল্যাটিন ও ফরাসী ভাষায় হযরত রসূল (স) এর উর্ধাকাশ পরিভ্রমণ সম্পর্কিত তিনটি পান্ডুলিপি আবিষ্কার করেন তখনই কেবলমাত্র এসব সন্দেহের অবসান ঘটে। এসব পান্ডুলিপি মূল আরবী থেকে অনূদিত হয়েছিল রাজা আলফানসোর উৎসাহে। ১৯৪৯ সালে এসব পান্ডুলিপি La Escala de Mahoma (মোহাম্মদের উর্ধারোহণ) নামে মাদ্রিদ থেকে প্রকাশিত হয়। পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবীরা অবশেষে নিশ্চিত হন দান্তে সম্ভবত ল্যাটিন অথবা ফরাসী ভাষায় হযরত রসূল (স) এর উর্ধাকাশে গমনের কাহিনী পড়ে থাকবেন।

একই সময় এনরিকো সিরুলি নামের একজন দান্তে বিশেষজ্ঞ ইউরোপীয় ভাষায় মেরাজের কাহিনীর সূত্র ধরে দান্তের উপর এর প্রভাবের কথা আলোচনা করেন। তার গবেষণার শিরোনাম ছিল- The Book of Muhammad's Ascension and the Question of the Arabic-Spanish source of the Divine Comedy. অন্য একজন ইতালিয়ান প্রাচ্যতত্ত্ববিদ লেবি দেল্লা ভিদা প্রায় একই ধরনের মতামত পোষণ করে লেখেনঃ

এ কথা আজ প্রমাণিত সত্য যে খৃষ্টান জগতে সেকালে দুটো ইউরোপীয় ভাষায় (ল্যাটিন ও ফরাসী) মেরাজের কাহিনী সহজলভ্য ছিল। যা দান্তের হাতের নাগালের বাইরে থাকার কথা নয়। এটা আজ নিশ্চিত আসিন পিলাকিউসের আবিষ্কার সন্দেহাতীত ভাবে বিতর্কের উর্ধে। আমাদের এখন কোন সন্দেহের মধ্যে থাকার কারণ নেই এই ভেবে যে দান্তে কোন প্রকার আরবী উৎসের দিকে হাত বাড়াননি। এটা এখন সহজভাবেই মেনে নেয়া উচিত।

মধ্যযুগে খৃষ্টান জগতের উপর ডিভাইন কমেডি এক অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। ইউরোপীয় জনমানসে দান্তের এ বিপুল জনপ্রিয়তার একটা কারণ হতে পারে স্বর্গ ও নরক ভ্রমণের প্রতীক গ্রহণ করে তিনি তার কবিসুলভ অভিলাষ চরিতার্থ করেছেন। হযরত রসূল (স) এর মেরাজের কাহিনীকে অবলম্বন করে দান্তে তার ডিভাইন কমেডিতে আকাশ প্রদক্ষিণের মাধ্যমে তিনি যেমন সমাজ ও ধর্মব্যবস্থার সমালোচনা করেছেন তেমনি তিনি তার কাব্যিক ও সাংস্কৃতিক ভাবধারাকেও প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দান্তের অমরজগতের উপর ইসলামী ঐতিহ্যের এই প্রভাব ইউরোপীয় রেনেসাঁর পিছনে ইসলামের অবদান থেকে বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। বুদ্ধিবৃত্তি ও মনীষার জগতে ইসলামের যে ঐতিহাসিক ও বৈশ্বিক অবদান, দান্তের উপর ইসলামী ঐতিহ্যের এই প্রভাব তারই একটি ক্ষুদ্রতম নজীর মাত্র।



www.pathagar.com

# জামালুদ্দীন আফগানী

উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জামালুদ্দীন আফগানীর মতো আর কেউ এত তীব্রভাবে প্রতিবাদ জানাননি। এশিয়া ও আফ্রিকার জাতিসমূহ ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর সামনে দিনের পর দিন বশ্যতার পতাকা বহন করে চলবে এ অবস্থা তিনি মেনে নিতে পারেননি। আফগানী মনে করতেন এসব জাতি বিশেষ করে মুসলমানরা যদি ঐক্যবদ্ধভাবে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয় তবে পরাধীনতার শিকল ভাঙ্গা তাদের পক্ষে সহজ হবে। তার এই মুক্তিমন্ত্রের নামই ছিল প্যান ইসলামিজম।

মুসলমানদের সমস্যাকে তিনি ভৌগলিক কিংবা রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে কখনো বিবেচনা করেননি। তার কাছে এটা পৃথিবীর সকল মুসলমানের সাধারণ সমস্যা হিসেবে প্রতিভাত হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীতেই আফগানীর প্যান ইসলামিজমের মন্ত্র বাংলাভাষী মুসলমানের হৃদয়কে নাড়া দেয়। পণ্ডিত রিয়াজ আল-দীন আহমদ মাশহাদী সমাজ ও সংস্কারক নামে আফগানীর এক সুলিখিত জীবনী প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তীকালে আফগানী ফ্রান্স থেকে আল উরওয়াতুল উসকা নামে যে পত্রিকা সম্পাদনা করতেন শোনা যায় তার কিছু ব্যয়ভারও বাংলার কোন কোন মুসলমান বহন করতেন। আফগানীর চিন্তাধারায় বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তুর্কী সুলতানের পক্ষে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন তিনি। এ তার বিশ্ব মুসলিম চিন্তারই ফসল। কবি গোলাম মোস্তফা ও কবি নজরুল ইসলামের অনেক কবিতাই প্যান ইসলামী ভাবধারায় লেখা।

তাঁর প্রতি বাংলাভাষী মুসলমানদের একদলের এই প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাশাপাশি আর একদলের বিরোধিতাও স্পষ্ট। আফগানী যখন কলকাতায় এসেছিলেন তখন নওয়াব আবদুল লতিফের মতো সেকালের শ্রেষ্ঠ মুসলমান নেতারা তাকে কলকাতা মাদ্রাসায় বক্তৃতা দিতে দেননি। পরে জাস্টিস আমীর আলীর চেষ্টায় আফগানী আলবার্ট হলের এক সুধী সমাবেশে বক্তৃতা করেন।

নওয়াব আবদুল লতিফের বিরোধিতার কারণ এখন আমরা বুঝি। উনবিংশ শতাব্দীতে মুসলমানরা জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে পিছিয়ে পড়েছিল। তার উপর মুজাহিদ আন্দোলন, সিপাহী বিদ্রোহ প্রভৃতি কারণে ইংরেজের রাজরোষ এসে পড়েছিল ভারতীয় মুসলমানদের উপর। নওয়াব আব্দুল লতিফ প্রমুখ চেয়েছিলেন এই রাজরোষ প্রশমন করে মুসলমানদের এগিয়ে নিতে। এটা অবশ্য ঠিক নওয়াব আব্দুল লতিফের কাছে ভারতীয় মুসলমানদের সমস্যাটাই মুখ্য ছিল। আফগানী বিশ্ব মুসলমানের কথা ভেবেছিলেন।

ভারতে এসে আফগানী এখানকার মুসলমানদের বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে ইংরেজ শাসন ও শোষণকে চিহ্নিত করেছিলেন। তাছাড়া মুসলমানদের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে অপরিচয়কেও তিনি তাদের ভাগ্য বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ মনে করতেন। আফগানী যেমন ভারতে এসে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছেন তেমনি তিনি যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আঘাত হেনেছেন। মিসর, ইরান, তুরস্ক সর্বোপরি মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে বৃটেনের ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আফগানীর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। আফগানীর দূরদৃষ্টিতে বিশ্ব মুসলমাননের জন্য আর একটি আসন্ন বিপদ আভাসিত হয়েছিল। তিনি মনে করতেন ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ মুসলমান দুনিয়ায় শুধু শোষণের হাত বাড়ায়নি তারা নিয়ে এসেছে জাতীয়তাবাদের বিষপাত্র। এই জাতীয়তাবাদের ধারণা মুসলমানদের মাযহাবী একতার মূলে কুঠারাঘাত হেনেছে। তাঁর চোখের সামনে দিয়ে



www.pathagar.com

মুসলমান দুনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদীরা কেমন করে ভৌগলিক ও গোত্রীয় চেতনা উস্কে দিয়েছে এবং আঞ্চলিকতার টানাপোড়েনে মুসলিম ঐক্যের মূল কেন্দ্র খেলাফত নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে। আফগানী পরিষ্কারভাবে বলেছেন ইসলামের মৌলচেতনার সাথে জাতীয়তাবাদের কোন সংশ্রব নেই। পাশ্চাত্য শক্তিগুলো ছলে বলে কৌশলে এই ইসলাম বিরুদ্ধ মতবাদকে মুসলমানদের মধ্যে জিইয়ে রেখে তাদের স্বার্থ হাসিল করে চলেছে।

মুসলমানদের ঐক্যের ভিত্তি হচ্ছে তৌহীদ এবং এই তৌহীদকে কেন্দ্র করে যে জাতীয়তাবাদ তার নাম হচ্ছে ইসলাম। সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলমানদের জাতীয়তার যে চেতনা তা হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে আন্তর্জাতিক। তা কখনো বর্ণ গোত্র ও ভূগোলের সীমানায় আটক নয়।

আফগানী সেকালের মুসলমান রাজন্যবর্গ যারা সাম্রাজ্যবাদের বরকন্দাজ হিসেবে কাজ করতে যেয়ে ভৌগলিক ও জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটিয়েছে তাদের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি মনে করতেন মুসলমান রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও সম্প্রীতি বজায় রাখা উচিত এবং সম্ভব হলে সমস্ত মুসলমান রাষ্ট্রগুলোকে একটি কেন্দ্রের অধীনে ন্যস্ত করে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে।

বিশ্ব মুসলিম ঐক্যের এই বাণী নিয়ে মুসলমান দেশগুলোতে আফগানী ক্লান্তিহীনভাবে ছুটে গিয়েছেন। মিসরকে নিয়ে যখন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ষড়যন্ত্রের খেলায় মেতে উঠেছিল তখন আফগানী সেখানে ত্রাণকর্তার ভূমিকায় হাজির হন। মিসরের শাসনকর্তা ছিলেন খেদিব ইসমাঈল পাশা। খেদিব ছিলেন বৃটিশ সরকারের অত্যন্ত কাছের লোক। তারই অদূরদর্শিতায় মিসর হয়ে পড়ে সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক। উপরন্তু ফরাসী ও বৃটিশ সরকার সুয়েজ খালের স্বত্ব ক্রয় করে সারা মধ্যপ্রাচ্যের উপর জেঁকে বসে। আফগানী সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মিসরবাসীকে জাগিয়ে তোলেন। তিনি বজ্র নির্ঘোষে বলেনঃ মিসর লিল মিসরিয়ীন, ওয়ামা সাহমা ফিহা লিল উবরিয়ীন-মিসরবাসীর জন্য মিসর, ইউরোপীয়দের তাতে কোন অংশ নেই। মিসরে এ সময় আফগানীর সাথে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন তার অন্যতম সাগরিদ মুফতী আবদুহু। আফগানী ও আবদুহুর প্রেরণায় মিসরে যে গণজাগরণের সূচনা হয়েছিল তাতে ক্রীড়নক সরকার ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আফগানীকে দেশ ত্যাগের নির্দেশ দেয়। আফগানী যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই তাড়া খেয়েছেন। তাঁর শত্রু ছিল সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক অদূরদর্শী ও অযোগ্য মুসলমান সুলতান ও রাজন্যবর্গ। তাঁর গুণমুগ্ধ ছিল সাধারণ মুসলমান জনগণ।

আফগানী যখন তুরস্কে যান তখন সুলতান আবদুল হামিদ তাকে বিপুল অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন! তিনি এই সুযোগে সুলতানকে প্যান-ইসলামিজমের চিন্তাভাবনায় প্রভাবিত করার চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু আফগানীর গতিশীল ও আধুনিক চিন্তাধারার সাথে সুলতান ও তার সালতানাতের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বেশিদিন আপোশ করে চলা সম্ভব হয়নি। কেননা আফগানী ছিলেন দ্রোহ ও বিপ্লবের বার্তাবাহক। ইসলামের অবিনাশী জীবনাদর্শের ভিত্তিতে পৃথিবী জোড়া মুসলমানদের নিয়ে যে রাষ্ট্রের কথা তিনি ভেবেছিলেন তাতে কায়েমী স্বার্থভোগীদের স্থান থাকার কথা নয়। তাই রাজন্যবর্গ তাঁর কথায় যথাযথভাবে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু তুরস্কের জনগণ বিশেষ করে তরুণ সমাজ আফগানীর বিপ্লবের বাণীতে যখন বিপুলভাবে সাড়া দিতে শুরু করলো তখন দুর্বল সুলতান ভীত হয়ে পুনরায় তাকে দেশ ত্যাগের নির্দেশ দিলেন।

আফগানীর জীবনে ইরানেও একই ঘটনা ঘটেছিল। ইরানের শাহের কুশাসনের বিরুদ্ধে কথা বলতে যেয়ে তিনি তার রোষের স্বীকার হয়েছিলেন। আফগানী আমৃত্যু দেশ থেকে দেশে


www.pathagar.com

ঘুরে বেড়িয়েছেন এই এক অতৃপ্ত কামনা নিয়ে যেখানে তার স্বপ্নের বিপ্লব সাধিত হবে। তাই ফলাফলের দিকে চোখ না রেখে তিনি শুধু বিপ্লবের বাণী ছড়িয়ে গেছেন। আফগানী কিছুদিন ফ্রান্সে অবস্থান করেছিলেন। এখানে বসে তিনি উরওয়াতুল উসকা বা দৃঢ় রজ্জু নামে এক বিখ্যাত পত্রিকা প্রকাশ করেন। এ পত্রিকার মাধ্যমে যেমন তিনি সাম্রাজ্যবাদীদের মুখোশ উন্মোচন করতেন তেমনি মুসলমানদের জাগরণ ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। এ পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলতে যেয়ে আফগানী লিখেছিলেন–

এ পত্রিকা প্রাচ্য জাতিসমূহকে তাঁদের কর্মপন্থার সুস্পষ্ট নির্দেশ দেবে। সে পন্থা অনুসরণ না করলে এ জাতিগুলোর ধ্বংস ও বরবাদী অনিবার্য। এ পত্রিকা এসব দেশের শরীফদের সামনে থেকে ভুলের পর্দা সরিয়ে নেবে এবং তাদের সুবাহ সন্দেহ দূর করবে। এসব দ্বিধা সংশয়ের দরুনই আজ তারা সত্য পথ থেকে বহুদূরে সরে রয়েছে। তাছাড়া তাদের মন থেকে ঐসব সংশয়ও দূর করবে, যার ফলে তাদের বিশ্বাস জন্মেছে যে তারা বিপদের শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে এবং তার কোন প্রতিকার নেই।

এ পত্রিকার আরো একটি নির্দেশ এই যে সমগ্র প্রাচ্য জাতিকে একতাসূত্রে আবদ্ধ হতে হবে এবং সে ঐক্যবন্ধনই হবে তাদের রাজনৈতিক আজাদীর সনদ। অন্যথায় পাশ্চাত্যের জাতিগুলো এ বন্ধন-মুক্ত দুর্বল জাতিগুলিকে পিষে মারবে।

আফগানী লন্ডনে বসে জিয়াউল খাফেকাইন নামে আরও একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। এ পত্রিকার সাহায্যেও তিনি তার আপন মতামত নির্ভীকভাবে প্রকাশ করতেন। ইউরোপে অবস্থানকালে আফগানীর সাথে বিখ্যাত দার্শনিক রেনানের সাক্ষাত হয়েছিল। এমনি এক সাক্ষাতকারের উল্লেখ করে রেনান বলেছিলেন, সামান্য দুমাসের পরিচয়ে আমি জামালুদ্দীনের বিরাট ব্যক্তিত্বের পরিচয় পেয়েছি। অতি কম লোকই এরূপ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। মানুষকে তিনি অতি সহজেই তাঁর প্রতি অনুরক্ত করে তুলতে পারেন। তাঁর সমগ্র চিত্ত ইসলামী ভাবধারায় অনুরঞ্জিত। অতীতের মহাপণ্ডিতদের বদনমন্ডল থেকে যে জ্যোতি বিকর্ণ হতো, জামালুদ্দীনের মুখমন্ডলেও আমি তা দেখতে পেয়েছি। বস্তুত জামালুদ্দীন যেন ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ প্রমুখ মহামনীষীদের প্রতিনিধি।

এটা সত্য আফগানীকে লড়াই করতে হয়েছিল মুসলমান সমাজের ভিতর ও বাহির দুদিক থেকেই। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের মতো দেশীয় সুলতান ও রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধেও তার অনুযোগের অন্ত ছিল না। কারণ আফগানী বহু ক্লান্ত মুহূর্তে এ কবিতাটি পড়তে পড়তে হযরত রসূল (স) এর ধ্যানে মগ্ন হয়ে পড়তেন–

> 'হযরত! তোমার ধর্ম শোভা, সৌন্দর্য এবং চাকচিক্যে এমনই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, সে ধর্মকে তুমি এসে যদি আবার দেখ তুমিই তাকে চিনবে না।'

আফগানী তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর রোপিত বিপ্লবের বীজকে মহীরুহ হতে দেখেননি। কিন্তু তার মৃত্যুর অনতিকালের মধ্যেই প্রাচ্যের বিশেষ করে মুসলমান দেশগুলোতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন তীব্র গতি লাভ করেছিল। মুফতী আবদুহু, মীর্জা বাকের, শেখ আহমদ সনৌসি, ইকবাল, মওলানা মোহাম্মদ আলী প্রমুখ এরা ছিলেন আফগানীরই ভাবশিষ্য। এদের অপরিসীম কর্মোদ্দীপনায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ভিত নড়ে গিয়েছিল। আফগানীর নাতিদীর্ঘ জীবন ব্যয়িত হয়েছিল মুসলমানদেরকে আজাদী ও ভ্রাতৃত্বের শক্তিতে সংহত করার সাধনায়। মুসলমানদের জন্য আফগানীর সেই নির্দেশ যে অত্যন্ত কার্যকর হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।


www.pathagar.com

# নজরুল ঃ পথিকৃত কবি

নজরুল তার সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সফলতা লাভ করেছেন। তার মনোহরণ কবিতা, চিত্তবিদারি গান এবং জীবন মানতা সমগ্র জাতির আশা আকাঙ্খা, প্রত্যাশা, প্রত্যয় ও জাগরণের মর্মমূলে স্থান করে নিয়েছে। তার মত করে আর কেউ বাঙ্গালী পাঠকদের আরো বিশেষ করে বললে বাঙালী মুসলমানদের চিত্তবৃত্তিতে এত বেপরোয়াভাবে শিকল ভাঙার গান গাওয়ার সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারেননি। নজরুলের আগেও বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে অনেক সাহিত্যব্রতীর আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় হলো তাদের সৃষ্টির মধ্যে প্রত্যয়ের পূর্ণ তেজ আমরা কখনো পুরোপুরি অবলোকন করতে পারিনি। নজরুলের মধ্যে এসে আমরা সেই অঙ্গীকারের শব্দগুলো দেখে প্রথমবারের মত সচকিত হয়ে উঠি।

নজরুল তার কবি জীবনের সূচনাতে শাতিল আরব, মোহররম, কোরবানী, খেয়াপারের তরণী প্রভৃতি যেসব জনপ্রিয় কবিতাগুলো লিখেছিলেন তার মধ্যে ব্যক্ত হয়েছিল মুসলমানের স্তিমিত প্রাণ জীবনধারার প্রতি ক্ষোভ ও ধিক্কার, সেই সাথে নতুন করে জীবনমানতার প্রতি এক নিষ্কুণ্ঠ কামনা। বলাবাহুল্য কবিতাগুলোর নতুনত্ব, অভিনবত্ব ও বাণীর অপূর্ব বিদ্যুৎ দীপ্তি সেকালেই বাংলা সাহিত্যে কবির ভবিষ্যৎ স্থান কোথায় হবে তার স্পষ্ট ইংগিত ঘোষণা করেছিল। এরপরে কবি বিদ্রোহী হাতে সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করেন। বিদ্রোহীর অন্তর্গত বাণী তার আগের লেখা কবিতাগুলো থেকে মোটেই বিচ্ছিন্ন নয় বরং বলা যায় বিদ্রোহীতে এসে তার প্রত্যয়ের পূর্ণতা লাভ ঘটে এবং নিজের অশেষ শক্তি সম্ভাবনা সম্বন্ধে তিনি আরও বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। বিদ্রোহীর প্রকৃতি বিচার করতে গেলে মানতেই হবে এমন তারুণ্যের শক্তির ও উন্মাদনার কবিতা বাংলা সাহিত্যে আর দ্বিতীয়টি নেই। বিদ্রোহীর মধ্যে কবির এক ধরনের আত্মবোধ আর আমিত্বের অঙ্গীকার আছে তেমনি তিনি নিজেকে বিবেচনা করেন জগতের সমস্ত দুস্থ মানবতার মুক্তিপথের কান্ডারী হিসেবে। একালে যারা জীবনবাদ ও গতিবাদের শ্রেষ্ঠ কবি, আমিত্বের অঙ্গীকার ঘোষণার যারা বার্তাবাহী যেমন ইকবাল ও ওয়াল্ট হুইটম্যান তাদের সাথে কবির বিদ্রোহীর অন্তর্গত বাণীর চমৎকার এক সাযুজ্যও লক্ষণীয়। বিদ্রোহীর এইসব চরণ লক্ষ্য করবার মতো–

আমি উন্মাদ আমি উন্মাদ
আমি চিনেছি আমারে আজিকে আমার
খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ।

নজরুলের কবিতার এই গতিমানতার দিকটি বুঝতে হলে আমাদের তার সময় ও কালের দিকে নজর দিতে হবে। হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম যখন কবি কাজী নজরুল ইসলাম হিসেবে বাংলা সাহিত্যের তোরণদ্বারে করাঘাত করতে শুরু করেন তখন বাঙালী মুসলমানের


www.pathagar.com

জীবনে চলছিল এক সর্বব্যাপী হতাশা ও প্রত্যয়হীনতার কাল। সিপাহী বিদ্রোহ ও ওহাবী বিদ্রোহ তখন পুরোপুরি পর্যুদস্ত হয়ে গেছে। ইংরেজের অপচার ও নৈরাজ্য প্রতিরোধ করবার শক্তি তখন মুসলমানদের একেবারেই নেই অথচ তাদের বিক্ষুব্ধ মানসিকতা তখনও খুঁজে ফিরছে একজন নিশানবরদারকে। এরকম দিক বিদেশহীন অবস্থায় নজরুলের আবির্ভাব হয়েছিল যখন তার প্রয়োজন পড়েছিল জিঞ্জির ভাঙা গানের বাণী তৈরীর। মোহররম কবিতার বিখ্যাত চরণগুলো আমরা মনে করতে পারি –

দুনিয়াতে দুর্মদ খুনিয়ারা ইসলাম–
লহু লও, নাহি চাই নিষ্কাম বিশ্রাম।

অথবা নজরুলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্যান ইসলামী কবিতা আনোয়ার পাশার দুএকটি চরণ দৃষ্টান্ত স্বরূপ নেয়া যেতে পারে–

আনোয়ার আনোয়ার
যে বলে সে মুসলিম জিব ধরে টানো তার।

এ সমস্ত কবিতার মধ্য দিয়ে কবির সমসাময়িক মুসলমান সমাজের জন্য এক প্রবল বেদনা ও বিক্ষোভ যেমন মর্মরিত হয়েছে তেমনি তাদের জড়তা, নির্জীবতা আর নিস্পৃহতাকে আঘাত করেছেন তিনি প্রচণ্ড গতিতে। নজরুল সাহিত্যের এই জীবন মানতা ও গতিমানতা হচ্ছে তার স্বকাল ও স্বসমাজের গতানুগতিকতা ও অচলায়তন ভাঙার অঙ্গীকার।

নজরুল বাংলার আপামর মুসলমান জনসাধারণের চিত্তে প্রবেশাধিকার পেয়েছিলেন এই কারণে যে তাদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রকৃত রূপটিকে তিনি পরিপূর্ণভাবে বাংলা কবিতা ও সংগীতের জগতে তুলে ধরতে পেরেছিলেন। কবি তার সুবিখ্যাত বড়র পীরিতি বালির বাঁধ প্রবন্ধের এক যায়গায় লিখেছেন ঃ 'বিশ্ব কলালক্ষীর একটা মুসলমানী ঢং আছে।' এই মুসলমানী ঢংটা তার মত আর কেউ বাংলা সাহিত্যের জগতে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। নজরুল এক হিসাবে বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহের সূচনা করেছিলেন বিপুল পরিমাণ আরবী ফারসী উর্দু শব্দের ব্যবহারের মাধ্যমে। পলাশীর বিপর্যয়ের পর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকে কেন্দ্র করে ইংরেজ পাদ্রী ও হিন্দু পন্ডিতদের বাংলা সাহিত্যকে মুসলমান প্রভাবমুক্ত করার জন্য যে রণমহড়া শুরু হয়েছিল বলা চলে নজরুল সেই বিপদাশংকা থেকে আমাদের রক্ষা করেছিলেন। নজরুলের আগে যে সমস্ত মুসলমান কবি ও লেখকরা এসেছিলেন তাদের সৃষ্টিতে এই মুসলমানী ঢং এর অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। তাদের সৃষ্টিতেও স্বসমাজের জন্য হাহাকার বোধ ছিল, পুনর্জাগরণের জন্য আকুতি ছিল কিন্তু যা ছিল না তা হচ্ছে বাঙালী মুসলমানের মুখের ভাষা, তাদের দৈনন্দিন সংস্কৃতির পূর্ণ প্রতিফলন। দেশ ও জাতির প্রতি নজরুলের এই প্রেম, মোহমুগ্ধতা, অঙ্গীকার ও আত্মনিবেদনের ছোঁয়াই তাকে এ কালে পথিকৃত কবির ঐতিহাসিক মর্যাদা দিয়েছে।


www.pathagar.com

# ফররুখ কাব্যে নান্দনিকতা

ফররুখ আহমদ সমুদ্র মন্থনের কবি। তার কবিতার বাতায়নে কান পাতলে শোনা যায় আদিগন্ত সমুদ্রের ফেনিল জলোচ্ছ্বাস। শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে অসামান্য দক্ষতা ও অফুরাণ সৌন্দর্যের দীপ্তিতে তিনি আভাসিত করে তোলেন এক সামুদ্রিক ক্যানভাস। এ ক্যানভাস শব্দের, বর্ণের, কল্পনার, রূপকল্পের, একই সাথে জীবনের। শিল্পরসিক ফররুখ আহমদের কবিতায় খুঁজে পান অপরূপ সুস্বাদ। কবির অফুরাণ সৌন্দর্য, কল্পনা ও রোমান্টিক জীবন চারিতার সংশ্লেষে প্রমূর্ত হয় ভাবের ছবি, শব্দের ছবি। কবির দীপ্ত জীবনবাদ ও প্রত্যয়ী আদর্শ তার গভীর অন্তর অনুভবের মাধুরীতে অবগাহন করে প্রতিফলিত হয় শিল্পের মুকুরে।

শিল্পী তার আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে শিল্প সৃষ্টি করেন। চিত্রী এঁকে চলেন মনোজ্ঞ সব চিত্র। তেমনি কবির ভাবনার আলোয় আলোকিত হয়ে, গভীর অনুভূতি ভাষাকে আশ্রয় করে কবিতার জন্মলাভ ঘটে। কবিমনের ধর্ম হচ্ছে আপনার মনের রসলীলাকে অন্যের মনে প্রতিষ্ঠিত করা, সংক্রমিত করা। সংক্রমনের এই পর্যায়ে কবি মনে আত্মপ্রকাশের যে উন্মুখরতা তীব্র হয়ে ওঠে তাই তিনি ষোলআনা ব্যবহার করেন তার সৃষ্টি কর্মে।

ফররুখ আহমদ রূপদক্ষ শিল্পী। একজন অসামান্য কাব্যের শিল্পীর মতই তার ভাবের বাহন ভাষা, তার কবিতার পূরোভাগে এসে নিশান উচিয়ে দেয়। কবিতার এই ভাষার পাঠক কিংবা শ্রোতা যখন কবির সাথে পরিচিত হয় তখন তাকে আর কেউই ভুলে থাকতে পারে না। খাঁটি শিল্পীর এখানেই সার্থকতা।

সান্তায়ানা বলেছেন কবি হলেন কথার স্বর্ণকার। কথার সোনা দিয়ে তৈরী করেন কাব্যের অলংকার। এ উক্তিতে পূর্ণতা না থাকলেও সত্যতা আছে। কারণ শব্দের যে ইন্দ্রিয়জ আবেদন বর্তমান তার দ্বারা কবি প্রলুব্ধ হন এবং এই শব্দের ভেলায় করেই কবি তার পাঠককে আমন্ত্রণ পাঠান। কিসের আমন্ত্রণ? কবির এই আমন্ত্রণের স্বরূপ সন্ধানইবা কি করে সম্ভব? শব্দ নিয়ে খেলা কিংবা শব্দের কারুকার্য নির্মাণই কবির শেষ কথা নয়। শব্দের বর্ণ ও বিভূতি প্রত্যক্ষণ তার কাছে চূড়ান্ত কিছু নয়। কবিরও থাকে স্বপ্ন এবং সেই স্বপ্নের ধারাবাহিকতাকে কবিতার পাঠক কিংবা শ্রোতার অন্তরে প্রবিষ্ট করিয়ে দেওয়াও কবির আরাধ্য। তাহলে এই স্বপ্নের প্রসারণ কি শুধুমাত্র শব্দের পাখায় ভর করে সম্ভব? এর সোজাসুজি উত্তর হচ্ছে, না। সেজন্য চাই শব্দের সাথে ছন্দ। এই ছন্দ কবিতার ছন্দ। এই ছন্দের আবেদন নিগূঢ় মর্মস্পর্শী এবং এ হল কবিতার সম্মোহনী শক্তি। এই ছন্দের আবেদনে আমাদের মন বুদ্ধি চৈতন্য দ্রুত সাড়া দেয় এবং মুহূর্তে সচকিত হয়ে ওঠে। সঙ্গীতের ছন্দ প্রত্যক্ষরূপে ক্রিয়াশীল কিন্তু কবিতার ছন্দ সৃষ্টি করে এক বর্ণোজ্জ্বল কল্পনার রঙে ঐশ্বর্যবান একটি আবহ। কবিতার এই প্রানোজ্জ্বল পরিবেশেই কাব্যপাঠক কাব্যানন্দের সুস্বাদ পান এবং কবির তৈরী কাব্যলোকে পরস্পরের প্রতিবেশী হন। কবির কথা পাঠক শোনেন। কবিতা হল


www.pathagar.com

কবির স্বপ্ন অনুভব অনুভূতির বিস্তার। জীবনের নানা অভিজ্ঞতা যা প্রতিমুহূর্তে কবিচিত্তের দ্বারে বারে বারে আঘাত হেনে যায় তারই নানা আকারের ছবি কবি তার কাব্যে প্রমূর্ত করে তোলেন। এই প্রমূর্তন প্রক্রিয়ায় কবি শব্দের সাথে ছন্দের সুষমাটুকু মিলিয়ে দেন। শব্দের নানা বর্ণোজ্জ্বল ও বৈচিত্রময় ব্যবহারে কবির কাব্য ঝলমল করে ওঠে। এই ধরনের কাব্যকলার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমরা পাই ফররুখ আহমদের কবিতায়। তার কবিতার প্রতিটি শব্দ ছন্দের বারান্দা দিয়ে হেঁটে চলে। তিনি যে অবস্থা বা প্রেক্ষিত বর্ণনা করেন তা তার আপন মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা ছবির সাথে সমন্বিত করে, আশ্চর্যভাবে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। কবির কাব্য থেকে এর উদাহরণ দেয়া যাক ঃ

কেটেছে রঙিন মখমল দিন, নতুন সফর আজ,
শুনছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক,
ভাসে জোরওয়ার মউজের শিরে সফেদ চাঁদির তাজ,
পাহাড়-বুলন্দ ঢেউ বয়ে আনে নোনা দরিয়ার ডাক;
নতুন পানিতে সফর এবার, হে মাঝি সিন্দবাদ। (সিন্দবাদ)

কবির বহু বিখ্যাত সিন্দবাদ কবিতার এ হচ্ছে সূচনাপর্ব। তাঁর রূপকাশ্রয়ী কবিতাগুলোর মধ্যেও এটি অন্যতম। মুসলিম ইতিহাসের একটি বিশেষ কালপর্বের প্রতিনিধি সিন্দবাদ। এই সিন্দবাদ একান্তভাবেই ঐতিহাসিক। কিন্তু কবির কথিত সিন্দবাদের প্রাকৃত চারিত্র্য রূপান্তরিত হয়েছে এবং কবিতায় উপমা ও রূপকল্পের প্রয়োগে নতুন নতুন অনুষঙ্গের সংগে তাকে যুক্ত করে কবি আধুনিক যুগের প্রেক্ষিতে এই ঐতিহাসিক চরিত্রকে অধিকতর চলমানতা ও তীক্ষ্ণতা দান করেছেন।

কবিতাটির সূচনা অংশে কবি সিন্দবাদের অভিযাত্রী মনের ঘাত-প্রতিঘাতের একটি শতদল, একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে পাঠককে উদ্দীপিত করেছেন। আলোচ্য চরণগুলির শব্দের লালিত্য ও ধ্বনি মাধুর্যে যে কোন পাঠকই চমকে উঠবেন। ধ্বনির পর ধ্বনি যুক্ত হয়ে এমন একটি বর্ণোজ্জ্বল আবহ উজ্জীবিত হয় যা এক অর্থে তুলনা রহিত এবং এর মাধ্যমে কবি কাব্য পাঠকের মনে একটি বিশেষ মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করেন।

ফররুখ আহমদের কবিতায় সমুদ্র, নাবিক, পানির ঢেউ এসব বাকপ্রতিমা বার বার উঁকি দিয়েছে। প্রকৃত পক্ষে কবি তার দীপ্ত সমুদ্রচারিতার বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে মানব জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন বলেই এমনটি হয়েছে। ফররুখের এই কাব্যকলার সাথে সুইনবার্ণের মত কবিদের আশ্চর্য যোগাযোগ রয়েছে যাদের কবিতার ধ্বনিমাধুর্য ও শব্দের লালিত্যের সাথে সমুদ্রের গর্জন একাকার হয়ে আছে। ফররুখ আহমদের বৈশিষ্ট্য হল তার ভাষার মনোহারিত্ব। এই ভাষার সম্মোহন শক্তি আমাদের প্রবলভাবে নাড়া দেয়। কাব্যপাঠক কবি কথিত একটি বিশেষ অবস্থা কিংবা মানসিক পরিবেশটুকুতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। আমাদের জীবনের গতিধারায় কবিচিত্তের প্রবহমানতা এসে ঢেউ তোলে। আমরা কবির কবিতা পড়ে মুগ্ধ হই, কবিতার ছন্দে আলোড়িত হই, কবির জৈবিক স্বপ্নের সাথে আমরা একাত্ম হয়ে


www.pathagar.com

পড়ি। কবির কবিতা মূলত একটি শব্দের নিপুণ কারুকাজ। একদিন কবি কল্পনায় যে সুরের ইংগিত দোলা দিয়েছিল তার সাথে কথা সংযোজন করে এই নিপুণ কবিতাকর্মটি তিনি সম্পন্ন করেছিলেন। কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যাক ঃ

১। পিপুল বনের ঝাঁজালো হাওয়ায় চোখে যেন ঘুম নামে
নামে নির্ভীক সিন্ধু ঈগল দরিয়ার হাম্মামে। (সিন্দবাদ)

২। আনি আল্‌মাস, গওহর লুটে আনি জামরুদ লাল,
নিথর পাতাল বালাখানা থেকে ওঠাই রাঙা প্রবাল,
এরা জিঞ্জিরে আটক চিড়িয়া হীন কামনায় বুড়া–
শিরাজী মত্ত! পাথর হানিয়া করি সব মাথা গুঁড়া। (সিন্দবাদ)

৩। কেশর ফোলানো পালে লাগে হাওয়া, মাস্তুলে দোলে চাঁদ
তারার আগুনে পথ বেছে নেয় স্বপ্নেরা সারারাত, (বার দরিয়ায়)

৪। কাল মাস্তুলে ঝড়ের কান্না শুনেছি একলা জেগে,
শুনেছি কান্না রাত জেগে দূর মরুভূর কূলে কূলে, (দরিয়ায় শেষ রাত্রি)

৫। তারার বন্দর ছেড়ে চাঁদ চলে রাত্রির সাগরে
ক্রমাগত ভেসে ভেসে পালক মেঘের অন্তরালে,
অশ্রান্ত ডুবুরি যেন ক্রমাগত ডুব দিয়ে তোলে
স্বপ্নের প্রবাল। (ডাহুক)

৬। ঐ দেখো স্রোতে অরূপ আলোতে সূর্যতরী
তীক্ষ্ণ আলোর তুফানে ছিঁড়িছে এ শর্বরী
এই কালো রাত জমাট তুহিন হিম-অতল,
ছিঁড়ে চলে যায় আলোর ছোঁয়ায় গলানো জল। (হে নিশানবাহী)

কাব্য রসিক এ সব চরণগুলোতে শব্দের অন্তরালে, অর্থের পশ্চাতে এক ধরনের ছন্দের সন্ধানে পুলকিত হন। এখানে যেমন আছে সন্ধানী কবির খুঁজে পাওয়া নানা বৈচিত্রের শব্দালংকার তেমনি শব্দকে নিয়ে আছে ছন্দের মন-মাতানো খেলা। ছন্দের সুরের এই খেলা অনিরুদ্ধ গতিতে চলতে থাকে বলেই ফররুখের কবিতা কাব্যরসিকের মনে সুরের অনুরণন জাগিয়ে তোলে। কাব্য পাঠকের প্রাণে প্রাণে কবির স্বপ্ন উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। যে কোন কাব্যরসিকই লক্ষ্য করবেন ফররুখের শব্দ যোজনা মর্মভেদী। মর্মকে স্পর্শ করে এমন সব শব্দ শুধু বিচিত্র সঙ্গীতের সৃষ্টি করে না, শব্দের পর শব্দ মিলে একটি বিচিত্রতর জটিল হার্মনি ঐকতান গড়ে ওঠে যার মধ্যে কবির স্বপ্নরা ডানা মেলে থাকে। কবির বহুবিখ্যাত 'বন্দরে সন্ধ্যা' কবিতা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেয়া যাক ঃ

ষোল পাপড়ীতে ঘেরা ষোড়শীর সে পূর্ণ যৌবনে
আসিল অতিথি এক বন্দরের শ্রান্ত মুসাফির!



www.pathagar.com

সূর্যাস্তের অগ্নিবর্ণ সেহেলির বিমুগ্ধ স্বপনে,
নিভৃত ইংগিত তার ডেকে নেয় পুষ্পিত গহনে,
অনেক সমুদ্র তীরে স্বপ্নময় হল এ শিশির,
তারার সোনালি ফুল ছিটে পড়ে রাত্রির অঙ্গনে॥

এই বর্ণনা নিছক তার্কিকের বর্ণনা নয় কিংবা অংক-শাস্ত্রবিদের শাস্ত্রীয় সংকেত মাত্রও নয়। কবির এই বর্ণনা কাব্য পাঠকের আবেগকে উজ্জীবিত করে। এই বর্ণনা শুধু বস্তু বা বিষয়ের কথা বলে না, বলে মানবাত্মার কথা, মানবাত্মার টানাপোড়েনের কথা, মানব মনের আকুল করা রহস্যের কথা। কবি তাঁর অনবদ্য ভাষায়, ছন্দের গতিতে, শব্দের সুষমায় কাব্যরসিকের স্তিমিত কল্পনাকেও উজ্জীবিত করে তোলেন। কবি এই যে তার কবিতার বিশিষ্ট আঙ্গিক-প্রকরণ ও শৈলীতে কাব্য রসিকের কল্পনাকে উদ্দীপিত করেন, তার ফলে রসিক নতুন কল্পনার আশ্রয়ে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এই অভিজ্ঞতা পুরাতনের বাঁধনকে ছিঁড়ে ফেলে নব নব ইন্দ্রিয়জ আবেদনকে সম্পৃক্ত করে নতুন রূপ পরিগ্রহ করে।

ফররুখ আহমদের কবিতায় তার অভিজ্ঞতার যে সংবেদনা চিত্রিত তা একেবারে তার নিজস্ব। তিনি যখন কোনকিছুর বর্ণনা দেন অথবা অভিজ্ঞতার বর্ণোজ্জ্বল রূপটিকে তিনি তার নিজস্ব শব্দ নির্বাচন ও প্রয়োজনের মাধ্যমে দেখান তখন তার সজীবতা কাব্যরসিকের কাছে অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ও দৃষ্টিনন্দন হয়ে ওঠে। ফররুখ আহমদের এই অভিজ্ঞতা ও স্বপ্নের স্বরূপ বিবেচনা করতে হলে তার কাব্য পটভূমিতে চোখ ফেরানো প্রয়োজন মনে করি। কবি ছিলেন রেনেসাঁ আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত। এ আন্দোলনের সময় ফররুখ আহমদ তাঁর কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্যের রূপায়নের দিকে দৃকপাত করেন। আরব্য উপন্যাসের কাহিনীকে প্রতিকী উপস্থাপনার মাধ্যমে কবি নতুন ব্যঞ্জনায় ও গভীর তাৎপর্যে বাঙময় করে তোলেন। তার কবিতায় মুসলিম জাগরণ, আত্মপ্রতিষ্ঠা ও বিজয়ের প্রতীকরূপে সিন্দবাদের দুঃসাহসিক আলেখ্য মর্মরিত হয়েছে। এসব কবিতায় আরবী ফারসী শব্দ সম্বলিত পুঁথি সাহিত্য থেকে বিস্তর শব্দ, শব্দবন্ধ, বাকপ্রতিমা, সংস্কৃতানুগ শব্দ শব্দবন্ধের সাথে সম্মিলনে এক অভূতপূর্ব মেলবন্ধন তৈরী করেছে। কবির ব্যবহৃত এসব শব্দ, উপমা, রূপকল্প কাব্যরসিকের ইন্দ্রিয়ের দ্বারে দারুণভাবে সাড়া জাগায়, তার আবেগকে দারুণ ভাবে উদ্বেল করে তোলে। শক্তিমান কবি মাত্রই উপমা ও রূপকের প্রশ্রয় দেন তার কাব্য বিষয়কে অধিকতর চলিষ্ণুতা দেবার লক্ষ্যে। আমাদের আশা-আকাঙ্খা, আমাদের ঐতিহ্য-অনুভূতির সাথে সম্পৃক্ত করে উপমা ও রূপকের মাধ্যমে কবি কাব্যের বিষয়বস্তুতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যভাবে বললে, আমাদের আবেগানুভূতিকে ইন্দ্রিয়জ আবেদনের সাথে যুক্ত করে তাকে প্রাণবন্ত করে তোলা হয়ঃ

অনেক মঞ্জিল দূরে পড়ে আছে মানুষের ঘাঁটি,
এখানে প্রেতের বহির্বাটি,



www.pathagar.com

এখানে আবর্তে পথ হারা
চলিতেছে যারা
তাদেরে দিয়েছে ডাক জড়তার ক্রুর আজদাহা,
শতকের সভ্যতায় এরা আজ হল তাই অন্ধ, গুমরাহা। (আউলাদ)

কবি বলেছেন সেই সব মানবতার পথিকৃত মানুষের কথা যারা বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে অনুপস্থিত। তিনি উপস্থিত করেছেন এক দুর্ভিক্ষ, মড়ক, বিভীষিকা ও মূল্যবোধ বর্জিত বর্বর আধুনিক সভ্যতার চিত্র। এ চিত্র তার কাছে প্রেতের বহির্বাটি। এ বাটিতে যাদের অবস্থান তারা আবর্তসঙ্কুল পথে সঞ্চরণশীল যার ঠিকানা তাদের কাছে অনুপস্থিত। এ সভ্যতাকে কবি বলেছেন অন্ধ, গুমরাহা সভ্যতা, যেখানে জড়তার ক্রুর আজদাহা মানুষের সাথে কৌতুক করে চলেছে। কবির এ কবিতার ভাষা রূপকাশ্রয়ী পঞ্চাশের মন্বন্তরকালীন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দেশভাগের জটিল কঠিন রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে কবি এ কবিতাটি রচনা করেছিলেন। কবি এ কবিতার সঙ্গীতময় ও চিত্ররূপময় ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে চারপাশের পার্থিব জগৎটাকে কাব্য রসিকের কাছে প্রতিষ্ঠা করেছেন। যে সঙ্গীতের সুর লহরীতে কবি একটি বার্তাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন, যে শব্দায়নের মাধ্যমে কবি তার ভাবের জাগরণ ঘটিয়েছেন এবং যেসব রূপকের মাধ্যমে ভাবকে তীব্রতর করেছেন ও পারিপার্শ্বিকতাকে জীবন্ত করে তুলেছেন তার সাথে আমাদের অভিজ্ঞতা ও আবেগকে সমন্বিত করলে ইন্দ্রিয় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে।

কাব্য শিল্পীর কাজ হচ্ছে শব্দের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ অন্য কথায় বললে প্রাণই শব্দের রূপে দোলা দেয়। বাইরের জগৎ কবির ভূবনরূপে আবির্ভূত হয় যে ভূবন কবির কাব্যের উপজীব্য। চিত্রশিল্পীর মতই কবিও রঙ ও রূপের সন্ধানী। কবি তার ভাবকে, আবেগের মাধুরীকে তার বিশিষ্ট শৈলীতে অনুপম করে তোলেন। কবির এই বিশিষ্ট শৈলী ব্যতীত কবিতা পাঠকের কাছে চিত্তহারী হয়ে ওঠে না। কবিরাও মানুষের কথা বলেন, মানুষের আবেগের কথা শব্দায়ন করেন। মানুষের জন্ম-মৃত্যু, প্রেম-অপ্রেম, জীবন-যৌবনকে ঘিরে শব্দের ক্যানভাস তৈরী করেন। কবিরা যখন এই সব বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা করেন তখন তাদের সৃষ্টিতে প্রাণের জোয়ার আভাসিত হয়। তাদের কাব্য স্মরণীয় হয়ে ওঠে। এই স্মরণীয় হওয়া তাদের কথা, বিষয়বস্তু, বক্তব্যের অতলস্পর্শিতা কিংবা সার্বজনীনতার জন্য নয় বরং তাদের বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গীর জন্য। কাব্যে কবিতায় মানুষের একটি মানসিক অবস্থাকে চিত্রিত করেন হৃদয় রঞ্জন করে; মৃত্যুহীন ভাষায়ঃ

সে নামে ডেকেছি আমি যে নামে ডাকেনি কেউ তাকে,
সে মন দেখেছি আমি যে মন দেখেনি কেউ আর
শরৎ রাত্রির মত যে মন মেলেছে লঘুভার
স্বপ্ন সুরভিত পাখা ম্লান করি ধূসর সন্ধ্যাকে। (সে নামে ডেকেছি আমি)

সংসারে হাজার হাজার মানুষ তার মানসীর জন্য, তার প্রেমাস্পদের জন্য এক ধরনের তীব্র আবেগের ঝড়ে আক্রান্ত হয়। কিন্তু ফররুখ আহমদের এই সনেটটিতে তারা সবাই তাদের


www.pathagar.com

অনুভূতির ভাষাকে খুঁজে পায়। কবি সবার আবেগের কথাটুকুকে আশ্চর্য মনোগ্রাহী ভাষায় শব্দায়ন করেছেন। কবির এ ভাষা সকল হৃদয়ের অনুরাগকেই প্রজ্জ্বলিত করেছে।

আসলে আবেগের রাজ্যে কাব্য হল মুকুটহীন সম্রাট। অন্য কিছুর মাধ্যমে আবেগকে এত সুন্দর, এত পরিশীলিতভাবে মর্মরিত করা যায় না। ফররুখের কবিতা ইন্দ্রিয়ের দ্বারে যেমন সাড়া জাগায় তেমনি আমাদের আবেগকে উদ্বেলিত করে। ফররুখ তার রোমান্টিকতাও স্থির অচঞ্চল আদর্শিক উত্তাপের আবাহনে আমাদের আবেগের প্রস্রবণকে মুক্ত করে দিয়েছেন। কবি মনে যে চিত্রকল্প ও সঙ্গীতের সমারোহ শুরু হয় এ হল কাব্য সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়। কবি এ প্রাচুর্যটুকু মনে মনে উপলব্ধি করেন। তিনি তার অনুভূতির প্রবলতা প্রকাশে উন্মুখর হয়ে ওঠেন। কবিতার মধ্যে কবি তার আবেগের প্রবলতাকে সঞ্চারিত করেন এবং কাব্য পাঠক কাব্যের বিশিষ্ট শৈলী ও গুণের দ্বারা কবি সঞ্চারিত আবেগের তাড়না অনুভব করেন। ফররুখ আহমদের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ সাত সাগরের মাঝি এই আবেগের তাড়নায়ই লেখা। জগতের বহু বিখ্যাত কবিতা ও কাব্য গ্রন্থের মতই কবি আবেগ-বিহ্বল অবস্থায় এই অসাধারণ কাব্য গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। তাঁর অন্যান্য অনেক কবিতায়ও এমনি আবেগ বিহ্বলতার নজীর দৃশ্যমান। রেনেসাঁ আন্দোলনকালীন সময়ে একটি জাতির জাগরণের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে কবি মনে যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল, প্রাণদ আবেগের জলকলরোল মুখর হয়ে উঠেছিল তারই প্রতিধ্বনি সাত সাগরের মাঝি ও সমগোত্রীয় কবিতাগুলিতে আমরা শুনতে পাই। কবি লিখেছেন ঃ

কত যে আঁধার পর্দা পারায়ে ভোর হল জানি না তা'
নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা
দুয়ারে তোমার সাত সাগরের জোয়ার এনেছে ফেনা
তবু জাগলে না? তবু তুমি জাগলে না? (সাত সাগরের মাঝি)

একটি জাগরণকামী জাতির উত্থানের ছবির কথা বলতে যেয়ে কবি হৃদয় নৃত্য করেছে। এই উত্থানকে তিনি একটি স্বপ্নীল রোমান্টিকতার ছায়াছন্নতায় কাব্য রসিকের কাছে পরিবেশন করেছেন। কবির কল্পনার বিস্তার ও গভীরতা কবিতায় দৃশ্যমান এবং সংগত কারণেই কল্পনার বিস্তৃতিকে হৃদয়গ্রাহী করবার জন্য কবি প্রকৃতির সৌন্দর্যের কাছে হাত পেতেছেন। এই কবিতায় যেমন আছে বিষয়ের মাহাত্ম্য এবং মহিমা তেমনি আছে কাব্যের সংগীত ও চিত্রকল্পের সমাহার। এর সাথে যুক্ত হয়েছে কবির অনুসন্ধানী মনের প্রচ্ছায়া। ফলে এই প্রবল আবেগমুখর কবিতার জন্ম সম্ভব হয়েছে।

ফররুখ আহমদ যথার্থ সৌন্দর্যশিল্পী। কিন্তু তার এই শিল্পীরূপ জীবন ধর্ম কেন্দ্রিক। তাই তার সৃষ্টিতে জীবন ও শিল্প পাশাপাশি বয়ে চলেছে। জীবন ও শিল্প যথাক্রমে যথার্থ জীবন ও যথার্থ শিল্প হয়ে উঠেছে। সেক্ষেত্রে উভয়ের ব্যবধান সামান্য ও নামাশ্রয়ী মাত্র। কল্পলোকের সাহিত্য তাই ফররুখ আহমদের কবিতায় জীবন গন্ধী হয়ে উঠেছে। সর্বকালের কবিতার রাজপথে ফররুখের কবিতা অমল ধবল শতদল হয়ে সৌরভ বিকীর্ণ করে চলেছে।


www.pathagar.com

# বঙ্গভঙ্গ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্রনাথ

কালান্তরের রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দুমেলার রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পার্থক্যটা বেশ স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ যখন কালান্তরের লেখাগুলো লিখছেন তখন তার দৃষ্টি অনেকখানি পরিচ্ছন্ন, প্রসারিত ও মানবিকতাবোধে আচ্ছন্ন বলে মনে হয়। কালান্তরের লেখাগুলো তার নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি উত্তরকালে রচিত। অন্তত নোবেল পুরস্কারের মান রক্ষার খাতিরে এ সময় রবীন্দ্রনাথকে কিছুটা হলেও বৈশ্বিক ও বিশ্বমানবিক চিন্তা-চেতনার অনুশীলন করতে হয়েছিল। কালান্তরের যুগে এসে রবীন্দ্রনাথ ভারতে হিন্দু-মুসলমান বিবাদের মূলসূত্রটা কিছুটা হলেও আঁচ করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয়। কিন্তু কবির সেই মানসিক রূপান্তর কতটা গভীর গ্রাহী হয়েছিল সে কথায় পরে আসছি।

এ কথা সত্য পুরস্কার পূর্বকালের রবীন্দ্রনাথ ছিলেন উনিশ শতকী কবি, যার চিন্তা চেতনা ও জগৎ ভাবনার বিকাশ ঘটেছিল সামন্ত পরিবেশে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর চাকুরে ও অনুরাগী তার পরিবারের সদস্যরা তখন উনিশ শতকের শহর কোলকাতায় নব-হিন্দুবাদের আদর্শে প্রণোদিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান ও জাগরণের সারথি হিসেবে কাজ করছে। বৃটিশের দাক্ষিণ্য ও করুণায় উনবিংশ শতাব্দীর এই যে হিন্দু মধ্যবিত্তের উত্থান তার বীজতলাটি পুরোপুরি সাম্প্রদায়িক ও গোঁড়া মানস ভাবনার মধ্যে সংস্থাপিত। যার ফলস্বরূপ এই জাগরণের ঢেউ হিন্দু সমাজের বাইরে মোটেই বিস্তারিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশব সেন, বঙ্কিম চন্দ্র আর আমাদের রবীন্দ্রনাথ সকলেরই উত্থান ঘটেছে এই অনুদার ও সংকীর্ণ হিন্দু-মানস ভাবনার বীজতলা থেকে। যার ফলে এই চিন্তা-চেতনার আবর্তনের মধ্য থেকে যে রবীন্দ্রনাথকে আমরা উত্থিত হতে দেখি সে রবীন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িক, অনগ্রসর দৃষ্টিবোধ সম্পন্ন ও অত্যাচারী শোষক জমিদার রবীন্দ্রনাথ। এই রবীন্দ্রনাথের হাতে তাই প্রথম সুরারোপিত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্প্রদায়িক সংগীত বন্দে মাতরম। এই রবীন্দ্রনাথ তাই দ্বিধান্বিত হন না ঠাকুর জমিদারদের প্রজাপীড়নের সংবাদে। এই রবীন্দ্রনাথ নিজের জমিদারীতে গরীব মুসলমান প্রজাদের উপর অন্যায়ভাবে করবৃদ্ধি করেন এবং বলপ্রয়োগে কর আদায়ের ফলে যে প্রজাবিদ্রোহ ঘটে তা তিনি নিষ্ঠুরভাবে দমনও করেন।

আরও আশ্চর্য হতে হয় বৃটিশের অনুগ্রাহী রবীন্দ্রনাথ যখন জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের ঘোর বিরোধিতা করেন এবং বৃটিশ শাসনের পক্ষে লেখালেখি করে প্রতিক্রিয়াশীলতার নমুনা স্থাপন করেন। এখানে স্মরণযোগ্য রবীন্দ্রনাথ রঁমারল্যাঁর কাছে ভারতে বৃটিশ শাসনের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে যুক্তি হাজির করে ভারতের পরাধীনতাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

এই অনুদার রবীন্দ্রনাথ যখন উনিশ শতকের সীমানা ডিঙ্গিয়ে বিশ শতকের আঙ্গিনায় এসে পড়েন তখন বাংগালী মুসলমান সমাজে এক বড় রকমের পালাবদল শুরু হয়েছিল। ১৯০৩ সালের ১২ই ডিসেম্বর বঙ্গ বিভাগ পরিকল্পনা ঘোষিত হয়। বৃটিশের এই পরিকল্পনা ছিল তাদের দীর্ঘদিনের প্রশাসনিক চিন্তাভাবনার ফসল। কিন্তু পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা এই


www.pathagar.com

পরিকল্পনাকে নিজেদের জন্য হিতকরী হিসেবে বিবেচনা করে। কেননা এর মধ্যে তারা তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ ও সমৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিল। অন্যপক্ষে হিন্দুরা তাদের শোষণ ক্ষেত্র হারানোর ভয়ে আতংকিত হয়ে ওঠে। এই আতংকই বংগভংগ বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে হিন্দুদের উৎকট ন্যাশনালিজমের গতিবেগ অর্জন করে। এই জাতীয়তাবাদ দ্রুত হিন্দুত্ব ও হিন্দু আদর্শের চারিত্র্যও অর্জন করে ফেলে ও মুসলমান স্বার্থবিরোধী হয়ে ওঠে। সে সময়কার যুগান্তর পত্রিকার একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি যাতে এর ধর্মীয় চরিত্র বুঝতে সহায়ক হয়–

> হে বাঙ্গালী, তুমি কি নর-কীট হতে জন্মেছিলে?..... যখন বাঙ্গালাদেশ দুভাগ হল দেখে সাতকোটি বাঙ্গালী মর্মাহত হয়ে পড়লো, সেদিনকার কথা আজ একবার ভাব। সেদিন স্বদেশের জন্য কোটি কোটি হৃদয়ের ব্যথা যেমনি এক হল, অমনি মাতৃরূপিনী স্বদেশ শক্তি পলকের মধ্যে বাঙ্গালাদেশের সর্বত্র আপনাকে প্রকাশ করিলেন, বাঙ্গালীও সর্বত্র আচম্বিতে বন্দে মাতরম বলিয়া উচ্চঃস্বরে মাকে আহ্বান করিল। ..... সেদিন যেন এক নিমিষের জন্য বাঙ্গালীর কাছে মা আমার প্রকাশিত হয়েছিলেন, সেদিন যে বাঙ্গালী বড়ই ব্যথা পেয়েছিল, ভেবেছিল মা বুঝি দ্বিখণ্ড হয়েছে, তাই মা আত্মপ্রকাশ করে বলেছিলেন, 'আমি দ্বিখণ্ড হই নাই, তোদের একত্র রেখে সহজেই শক্তিদান কর্তুম, আজ সেই বাঁধা ঘর শত্রুরা ভেঙ্গে দিল মাত্র, যেদিন আমার জন্যে স্বার্থ ও সংসারকে তুচ্ছ জ্ঞান করে প্রাণ দিতে অগ্রসর হবি, সেদিন আবার সেই শক্তিতরঙ্গ মাঝে আমার দেখা পাবি, আমি মরি নাই। ..... এস বাঙ্গালী, আজ মার সন্ধানে বেরুতে হবে। সেবার মা আপনি এসে দেখা দিয়েছিলেন, এবার মার জন্য রুধিরাক্ত হৃদয়ের মহাপীঠ প্রস্তুত করে মাকে খুঁজে খুঁজে কারামুক্ত করে নিয়ে আসব। ..... একবার সকলে বুকে হাত দিয়ে হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কর দেখি, প্রাণ, অর্থ, বিদ্যা, মন, সংসার সমস্ত পণ করে আজ মার সন্ধানে বেরুতে পারবে কিনা? ..... বাঙ্গালীকে বন্দে মাতরম মাতৃমন্ত্র শিখাইতে হইবে। ..... সর্বাগ্রে মাকে সাক্ষাত বন্দনা কর, মাকে তাঁর উপযুক্ত আসনে অধিষ্ঠিত করিলে বিদ্যা, অর্থ, মোক্ষ ইত্যাদি সবই ক্রমশ আসিয়া পড়িবে।

লক্ষ্য করবার বিষয় হলো এখানে বাঙ্গালী বলতে হিন্দু ও হিন্দুত্বের সমার্থক যা কিছু তাকেই বোঝানো হয়েছে। এই বাঙ্গালীত্বের চাঁদোয়ার তলে পূর্ব বাংলার বাংলাভাষী মুসলমানদের কোন স্থান নির্দিষ্ট হয়নি। এই যে হিন্দু জাতীয়তাবাদী উন্মাদনা এর সাথে উনিশ শতকীয় অন্তর মানস জাত সাম্প্রদায়িক চেতনার রবীন্দ্রনাথের একাত্ম হতে মোটেও সময় লাগেনি। পূর্ব বাংলায় তার জমিদারী ছিল। এই জমিদারী হারানোর ভয় বিষয় বুদ্ধি তাড়িত রবীন্দ্রনাথকে তাৎক্ষণিকভাবে বিচলিত করেছিল বোধ হয়। তাছাড়া এ ধরনের ধর্মোন্মাদনাযুক্ত আন্দোলনে অংশগ্রহণে তার এক ধরনের প্রস্তুতিও ছিল। উনিশ শতকের শেষ দিকে বালগঙ্গাধর তিলক প্রমুখের প্রশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতায় যে হিন্দু মেলা ও শিবাজী



www.pathagar.com

উৎসবের রেওয়াজ চালু হয়েছিল তাতে রবীন্দ্রনাথের সায় ছিল। কবি নিজে শিবাজী উৎসব নামে কবিতা লিখেছিলেন এবং এক ধর্ম রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন।
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী দুটি সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং বঙ্গভঙ্গ বাস্তবায়নের দিনকে রাখিবন্ধন দিবস হিসেবে ঘোষণা দেন। রাখি বন্ধনের দিন সকালে গঙ্গাস্নানের মিছিলে কবি স্বয়ং নেতৃত্ব দেন। এই গঙ্গাস্নান অনুষ্ঠানে কবি স্বরচিত প্রার্থনা সংগীত গেয়ে শোনান। সে প্রার্থনা সংগীতটি ছিল এরকম–

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার হাওয়া বাংলার ফল
পুন্য হউক পুন্য হউক।
পুন্য হউক হে ভগবান। .....

উল্লেখ্য এ সময় রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে সামনে রেখে আরও কয়েকটি হিন্দুধর্মাশ্রিত সংগীত রচনা করেন। এর মধ্যে 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' অন্যতম যা বর্তমানে আমাদের জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত হয়েছে। এ গানে দেশকে মাতৃবন্দনার স্বরূপে বিবেচনা করা হয়েছে।
রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনা সংগীত শেষে বীডন উদ্যান ও অন্যান্য যায়গায় রাখিবন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন বিকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোলকাতার পার্শীবাগান মাঠে অখণ্ড বাংলার বঙ্গভবন স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রাথমিকভাবে ফেডারেশন হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এখানে রবীন্দ্রনাথ একটি জ্বালাময়ী অভিভাষণ পাঠ করেন যাতে উল্লেখ করা হয়ঃ
যেহেতু বাঙ্গালী জাতির সার্বজনীন প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া পার্লামেন্ট বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করিয়াছেন, সেহেতু আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের কুফল নাশ করিতে এবং বাঙ্গালী জাতির একতা সংরক্ষণ করিতে আমরা সমস্ত বাঙ্গালী আমাদের শক্তিতে যাহা কিছু সম্ভব তাহার সকলই প্রয়োগ করিব।
রবীন্দ্রনাথ তার কথা রেখেছিলেন। পরবর্তীকালে অর্থ, বুদ্ধি ও নৈতিক সমর্থন যুগিয়ে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে শুধু তিনি প্রশ্রয় দেননি; বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের উদ্ভব তাকেও তিনি পূর্ণ মাত্রায় সহযোগিতা করেছেন।
শ্রী অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে যে সাম্প্রদায়িক বিপ্লবী দল গড়ে উঠেছিল তার সাথে রবীন্দ্রনাথের যোগ ছিল। একথা রবীন্দ্রনাথ নিজেও স্বীকার করে লিখেছেন–
আমাদের দেশে যখন স্বদেশী আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল, তখন আমি তার মধ্যে ছিলাম। মুসলমানরা তখন তাতে যোগ দেয়নি, বিরুদ্ধে ছিল।
হিন্দুদের প্রবল আন্দোলনের মুখে বৃটিশ সরকার মুসলমানদের সর্বনাশ করে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করে। এর একটা কারণ ছিল। তখনকার মত বিষয় বুদ্ধিতে অগ্রসর প্রবল হিন্দু সম্প্রদায়কে, দুর্বলকণ্ঠ সংখ্যালঘু মুসলমানদের বৈষয়িক স্বার্থের জন্য বৃটিশ সরকার অসন্তুষ্ট করতে চায়নি। উল্লেখ্য বঙ্গভঙ্গ রদের পর মুসলমানদের সান্ত্বনা দেবার জন্য বৃটিশ সরকার ১৯১২ সালে ঢাকায় একটি


www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানদের যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল তাকে যারা সহ্য করতে পারেনি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও তাদের কাছে মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতার মধ্য দিয়ে মুসলমানদের প্রতি সেকালের হিন্দু মনোভাব সবচেয়ে ন্যাক্কারজনকভাবে ফুটে ওঠে। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্যে গুরুতর বিপদ অবলোকন করে। এই গুরুতর বিপদটাই ছিল মুসলমানদের উত্থান ও উন্নতি। এই উত্থান ঠেকানোর জন্য কোলকাতার হিন্দু এলিটরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে ১৮ বার স্মারকলিপি সহকারে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। ডঃ স্যার রাসবিহারী ঘোষের নেতৃত্বে হিন্দু প্রতিনিধিগণ বড়লাটের কাছে এই বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করেন যে পূর্ববাংলার মুসলমান অধিকাংশই কৃষক। অতএব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করলে তাদের কোন উপকার হবে না। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় মুসলিম স্বার্থের বিরোধিতা করবার জন্য সব হিন্দু যেমন এক হয়েছিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতার ক্ষেত্রেও তাদের একই ভূমিকা দেখা গেলো। সে আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের কি ভূমিকা ছিল? দেখা যাচ্ছে এখানেও কবি সংকীর্ণ ও অনুদার মনোভংগীর উর্ধে উঠতে পারেননি। ১৯১২ সালের ২৮শে মার্চ কোলকাতার গড়ের মাঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে হিন্দুরা সভা করে। সে সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বয়ং কবি রবীন্দ্রনাথ। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো রবীন্দ্রনাথের পূর্ববঙ্গীয় মুসলমান প্রজারা লেখাপড়া শিখে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়ন করুক এটাও কবি চাননি। রবীন্দ্রনাথের চিন্তা, চেতনা, মনন ও মনীষার এই উনিশ শতকীয় ধারা অবশ্যই আমাদেরকে লজ্জা না দিয়ে পারে না। কালান্তরের যুগে রবীন্দ্রনাথ যতটুকু পরিবর্তিত হয়েছিলেন সে তার ভিতরের চাপে নয়, বাইরের পৃথিবীর সাথে সংযোগ রাখার প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে। নোবেল পুরষ্কার পাওয়ার পর কবি আরো আটাশ বছর অমিত বিক্রমে লেখালেখি করেছেন। কিন্তু প্রতিবেশী মুসলমান সম্প্রদায়কে নিয়ে তেমন কিছু লেখার প্রয়োজন তিনি মনে করেননি। তাদের কোন কিছুই তার কাব্য প্রেরণার বড় একটা উৎস হতে পারেনি। তার কৈশোর যৌবনে পাওয়া সামন্ত মানস পরিবেষ্টনীর অনুদারতাকে উপেক্ষা করে বৈশ্বিক মানবের কাছাকাছি পৌছানো তার পক্ষে কখনোই পুরোপুরি সম্ভব হয়নি। আফসোস তার জন্য।



www.pathagar.com

# বঙ্গভঙ্গ ও সেকালের হিন্দু মানস

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজের শাসন পুরোপুরি কায়েম হবার মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক ভারতে ইংগ-হিন্দু মিত্রতার যে চরম বিকাশ ও সমৃদ্ধি সাধিত হয় তার একটা বড় চারিত্র্যলক্ষণ ছিল মুসলমান বিদ্বেষ। ইংরেজ রাজত্বে মুসলমানের অবস্থা যেমন শোচনীয় হয়ে পড়ে তেমনি হিন্দুর অবস্থার শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে সমান তালে। ইংরেজের রাজত্বে হিন্দু অসহায় বোধ করেনি বরং ইংরেজের যাবতীয় আগ্রহ অনুগ্রহ সেদিন হিন্দুর শিরেই বর্ষিত হয়। ইংরেজের রাজত্বকেও হিন্দু পরাধীনতা জ্ঞান করে তার বিরোধিতায় নেমে পড়েনি, উল্টো ইংরেজের শিক্ষাদিক্ষা আচার ব্যবহার তাড়াতাড়ি করায়ত্ত করে নতুন শাসকের প্রসন্নতা অর্জনে উঠে পড়ে লাগে। ইংরেজ বনিকের দেওয়ান মুন্সী হিসেবে, পরে তার তৈরী জমিদার হয়ে, হিন্দু শুধু ইংরেজের ভক্তই হলো না, ইংরেজ রাজত্বের পরম সেবক ও সৈনিক হয়ে উঠলো। এ কারণেই উনিশ শতকে ইংরেজের হিতৈষণায় শহর কোলকাতাকে কেন্দ্র করে যে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান ঘটলো, যারা সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজ ভাবনায় বেশ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখা সত্বেও সাম্প্রদায়িকতা ও বিভেদবুদ্ধির অচলায়তনকে যেমন ভাঙ্গতে পারলো না তেমনি ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলনেও তাদের কোন ভূমিকায় দেখা গেলো না। তাই ১৮৫৭ সালে যখন দেশজুড়ে আজাদীর সংগ্রাম চলছে কোলকাতার বাবুরা তখন দুহাত তুলে ইশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে ইংরেজের রাজত্ব যাতে স্থায়ী হয়। অপর পক্ষে পুরো উনিশ শতক জুড়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে মুসলমানরা। এ একটা জাতির জন্য পরম গৌরব ও আত্মশ্লাঘার কথা। মুসলমানের প্রতিরোধ যত বাড়ছে, শক্তিশালী ইংরেজের জুলুমবাজী ঠিক সেই হারে স্ফীত হচ্ছে। তাদের ভাষাকে ছিনিয়ে নেয়া হলো, তাদের জমিদারী কেড়ে নিয়ে হিন্দুদের মধ্যে বিলি বন্টন করে দেয়া হলো, তাদের শত শত বছরের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর আয়ের উৎস অয়মা ও লাখেরাজ সম্পত্তিও হাত ছাড়া হয়ে গেলো এবং এই ভাবে এ শতকে এসেই ইংরেজ সিভিলিয়ান হান্টার সাহেবের ভাষায় মুসলমানরা একটা কাঠুরের জাতিকে পরিণত হলো। ইংরেজের এই জুলুমবাজী ও বেইনসাফীর সঙ্গী ও সহযোগী হলো সেদিন হিন্দু। তারা সেদিন তাদের স্বদেশীয় প্রতিবেশীদের দিকে সহৃদয় দৃষ্টিতে তাকাতে পারলো না। এই হলো উনিশ শতকের চালচিত্র। এই মানসভাবনা ও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিজাত চেতনা নিয়ে বাংলার হিন্দু যখন বিশ শতকের সিঁড়িতে এসে পা দিলো তখনই সারাদেশ জুড়ে ঘটলো বিপ্লবাত্মক এক ঘটনা। ঘটনার প্রেক্ষাপট তৈরী হচ্ছিল আরো কিছুদিন আগে থেকেই। ১৮৫৭ সালের মহাবিপ্লবের পর শক্তিশালী ইংরেজের বিপক্ষে মুসলমানের প্রতিরোধ যখন পূর্বেকার মতো আর সতেজ রইলো না তখন একশ্রেণীর মুসলমান নেতৃত্ব নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই ইংরেজের সাথে প্রতিরোধের নীতি প্রত্যাহার করে এক সহযোগিতামূলক সম্বন্ধ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন।

তখনকার মত ইংরেজের শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করে ইংরেজ আমলাতন্ত্রে চাকরী বাকরী গ্রহণ পূর্বক নিজেদের বিষয় সম্পত্তি, জীবন জীবিকার পথকে প্রশস্ত করার কথা তারা ভাবতে থাকেন। এসব আন্দোলনে মুসলমানদের পক্ষে সেকালে বড় রকমের ভূমিকা রেখেছিলেন নওয়ার আবদুল লতীফ, জাস্টিস আমীর আলী প্রমুখ নেতারা। এদেরই প্রশ্রয় ও প্রেরণায় মুসলমানরা যখন একটু একটু করে ইংরেজী শিক্ষায় অগ্রসর হতে লাগলো এবং ইংরেজ আমলাতন্ত্রের চাকরীতে কালক্রমে তাদের ন্যায্য ভাগ চেয়ে বসলো তখন হিন্দুর শুধু টনকই নড়লো না, তারা মুসলমানের দিকে চরম অনাগ্রহ ও প্রীতিহীনতার চোখে নজরও তুলে


www.pathagar.com

ধরলো। এরই মধ্যে যখন বংগ-ভংগ হলো এবং মুসলমানের জন্য প্রতিপত্তি ও জীবন জীবিকার পথ আরও অবারিত হলো তখন বাংলার হিন্দু এ পরিবর্তনকে মোটেই স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারলো না। হিন্দুর ভাবটা এমনই হলো যে আমরাই ইংরেজকে ক্ষমতায় বসিয়েছি, তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার ও সংহতি নির্মাণে দিবারাত্র খেটেছি আর আমাদের সাথে এহেন আচরণ- সুতরাং এর সমুচিত প্রতিকার চাই।

তাই বংগ বিভাগের পরিকল্পনা যখন ঘোষিত হলো, কোলকাতাকেন্দ্রিক বাবু বুদ্ধিজীবি, জমিদার ও রাজনীতিবিদরা একজোট হয়ে এ পরিকল্পনার বিরোধিতা আরম্ভ করলো। ইংরেজের সম্পূরক শক্তি হিসেবে এতকাল যাদের উত্থান ও সমৃদ্ধি সম্ভব হয়েছিল, এ পরিকল্পনার মধ্যে তাদের বৈষয়িক স্বার্থ বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনায় তারা এবার ইংরেজের বিরোধিতা করবার ঝুকিও নিল। লক্ষণীয় দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ডাকও যাদেরকে কখনো শিহরিত কিংবা আন্দোলিত করেনি, বঙ্গবিভাগ পরিকল্পনার মধ্যে মুসলমানের ভাগ্যোদয়ের সম্ভাবনায় এবার তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো। কোলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণহিন্দুদের ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ছিল এরকম ঃ গত ১৫০ বছরের মধ্যে বাঙ্গালী আর কখনো এতবড় দুর্দিনের শিকার হয়নি। তার মানে ১৫০ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো ইঙ্গ হিন্দু মিত্রতা বড় রকমের আঘাত পেলো এবং ইংরেজের হিতৈষণায় পূর্ববঙ্গে বেড়ে ওঠা কোলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণ হিন্দুদের শোষণের দরজা সংকুচিত হয়ে এলো।

বংগভংগের অভিঘাতে বাংলার হিন্দুদের মধ্যে যে আন্দোলন স্ফুরিত হলো তার শিকড় ছিল পুরোপুরি সাম্প্রদায়িকতার বীজতলায় প্রোথিত। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো অন্তঃস্বরূপে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতা জিইয়ে রেখেও হিন্দু নেতারা সেদিন বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের শ্লোগান নিয়ে মাঠে নেমে পড়লেন। বঙ্গিমচন্দ্রকে গুরু মেনে, কালিমন্দির তথা হিন্দু ধর্মকে কেন্দ্র করে আন্দোলন দানা বাধলেও বাইরে তারা ভেক ধরলেন বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ও অভিন্ন বাঙ্গালী সংস্কৃতির তারা বলতে লাগলেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, বাঙ্গালী সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদকে ক্ষতিগ্রস্ত করতেই বঙ্গভঙ্গ করা হয়েছে।

বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ও সংস্কৃতি শব্দদ্বয়ের মধ্যে একটা অদ্ভুত মাদকতা আছে এবং এ মাদকতা আজও এদেশের মানুষের একাংশের মনকে রাহুগ্রস্ত করে রেখেছে। এ রাহুগ্রস্ততার উদ্ভব এই বঙ্গভঙ্গের কাল থেকে। রঙ্গভঙ্গের বিরোধীরা সেদিন বাঙ্গালী সংস্কৃতির নামে জয় বাংলা শ্লোগান চালু করেছিল, বঙ্গভবন প্রতিষ্ঠা করেছিল, পৌত্তলিকাশ্রয়ী রবীন্দ্র সংগীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গানের গীতি মহড়া দিয়েছিল। এর সবকিছুই কালান্তরে আমরা গ্রহণ করেছি এবং বর্ণহিন্দুদের এসব শোষণের প্রতীককে আজও আমরা মাহাত্ম্য দিয়ে চলেছি।

সেদিনের হিন্দু নেতারা যে পূর্ববঙ্গের নিরন্ন ও হতদরিদ্র মুসলমানদের তিলমাত্র কল্যাণ চাননি, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ও শ্রেণী স্বার্থের কারণেই কোলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু গোষ্ঠী বঙ্গবিভাগের বিরোধিতা করেছিলেন সেসব কথা মওলানা আবুল কালাম আজাদ, বি, আর আম্বেদকর, কমরেড মোজাফ্ফর আহমদ নীরদ সি. চৌধুরীর মত মনস্বী ব্যক্তিরাও স্বীকার করে গেছেন। সে আলোচনা এখানে বাহুল্য। পূর্ব বংগ ও তার অধিবাসীদের জন্য ভালবাসার পরাকাষ্ঠা হিসেবে যে আন্দোলন পরিচালিত হয়নি একটা উদাহরণ দিলে পরিষ্কার হবে। ১৯১১তে যখন ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয় তখন কিন্তু সবার অলক্ষ্যে বাংলাকে ভাগ করা হয়। বিহার ও উড়িষ্যাকে ভাগ করে পৃথক দুটি প্রদেশ গঠন করা হয় এবং ভারতের রাজধানী কোলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। যেখানে সম্প্রদায় নির্বিশেষে বাংলার


www.pathagar.com

স্বার্থ কোলকাতার সাথে জড়িত ছিল এবং দীর্ঘদিন ধরে বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতি ও বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে কোলকাতার গুরুত্ব ছিল সমধিক, সেখানেও কোলকাতার রাজধানী মর্যাদা হারানোকে এইসব বর্ণহিন্দুবাদী স্বদেশীরা নির্দ্বিধায় মেনে নেয়।

১৯৪৭ সালে যখন বাংলাকে অখণ্ড রেখে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা করা হয় তখনও দেখা গেছে এই সব বর্ণহিন্দুরা ভারতের অপরাপর হিন্দুদের মতই সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প উদ্গীরণ করে ভারতীয়ত্বের মধ্যে তাদের কথিত বাঙ্গালীত্বের বিসর্জন দেয়। তাহলে কোথায় গেল বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ? বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ যে প্রথমাবধি এদেশের মানুষের কাছে একটা বড় রকমের কুয়াশা হয়ে ঝুলে আছে এটা বুঝবার জন্য অতিরিক্ত মেধার প্রয়োজন নেই।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে অনেকে স্বদেশী আন্দোলন বলে চালাতে চান। এ আন্দোলনে বৃটিশ উপনিবেশ বিরোধী কিছু উপাদান যুক্ত হয়েছিল ঠিক কিন্তু বাঙ্গালী হিন্দুর এই বিরোধিতার লক্ষ্য ছিল মূলত পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের স্বার্থহানি, ১৫০ বছরের পুরনো মিত্রের ক্ষতি সাধন নয়। মূখ্যত মুসলমান বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতাই এই বহুল কথিত স্বদেশী আন্দোলনের প্রাণশক্তি যুগিয়েছিল। স্বদেশী আন্দোলনের নেতা বিপিনচন্দ্র পালের লেখা বই Soul of Indiaর একাংশ এখানে উদ্ধৃত করছি যাতে এ আন্দোলনের প্রকৃতি বুঝতে সুবিধা হয়–

'আমাদের কালে জাতীয় চেতনার ও আশা আকাঙ্খার নব জাগরণ প্রাচীন কালের শাক্তধর্মের আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল এবং দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, ভবানী এবং প্রাচীন হিন্দু শক্তি উপাসকের কল্পিত মূর্তি ও অবয়বগুলি এক নতুন রূপে দেখা দিল। এই সকল প্রাচীন ও সনাতন দেবদেবীগণ যাঁরা আধুনিক মানুষের মনের ওপর সকল রকম প্রভাব হারিয়ে ফেলেছিলেন তারা দেশবাসীর চিন্তায় ও আত্মায় এক নতুন ঐতিহাসিক ও জাতীয়তাবোধক ব্যাখ্যা নিয়ে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হলেন। দেশের লক্ষ লক্ষ লোক আজ দেশকে দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী বলে পূজা করছেন ..... আমাদের সমাজ মানসের এবং জাতীয় অবয়বের এইটাই চরমতম বিকাশ, আমাদের মনুষ্যত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের সঙ্গে ইহা অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।'

বঙ্গভঙ্গের কার্যকারিতা মুসলমানরা ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। কারণ বৃটিশ সরকার হীনবল মুসলমানের স্বার্থে অধিকতর শক্তিশালী পুরনো মিত্র হিন্দুদের চটিয়ে সাম্রাজ্যিক সংহতির জন্য তাৎক্ষণিকভাবে কোন বিপদ ডেকে আনবার ঝুঁকি নিতে চায়নি। অন্যদিকে আশা ভংগের বেদনায় মুসলমানরা বুঝতে পেরেছিল তাদের ভাগ্যোন্নয়নের পথ ও পাথেয় নিজেদের ভিতর থেকেই সন্ধান করতে হবে। তাদের এই আত্মোপলব্ধি ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠাকে ত্বরান্বিত করে এবং পরবর্তীকালের ইতিহাস বঙ্গভঙ্গের পথ ধরে মুসলিম স্বাতন্ত্র রচনার দিকে দ্রুত ধাবিত হয়। বঙ্গভঙ্গের রাজনৈতিক ফলাফল মুসলমানের জাতীয় জাগরণ ও জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে যেমন দ্রুতগামী করে তেমনি বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের ভেকধারী বর্ণহিন্দুর সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মুখোশ খুলে দেয়।

যারা এপার বাংলা ওপার বাংলার ঘুমপাড়ানী গান দিয়ে এদেশের মানুষকে নিস্তেজ করে রাখতে চান, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন তাদের জন্য একটা বড় রকমের নির্দেশনা রেখে গেছে এই যে, এপার বাংলা ওপার বাংলা সমন্বয়ধর্মী নয়, মূলত বিভেদধর্মী। একই ভাবে অভিন্ন বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ও সংস্কৃতির ধারণাও একটা কাব্যিক সৌখিনতা মাত্র, রাজনৈতিক বাস্তবতা মোটেও নয়। এপার বাংলা ওপার বাংলার এই বিভেদকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন অন্তরের ভাগ। এই ভাগকে স্বীকৃতি না দিয়ে যারা বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের নামে রাজনীতির মাঠকে গরম করেন তারা যে প্রকারান্তরে কোলকাতাকেন্দ্রিক সেই বর্ণহিন্দুদের বরকন্দাজ হিসেবে কাজ করেন তা বুঝবার সময় এসেছে।



www.pathagar.com

# দি স্পিরিট অফ ইসলাম

দি স্পিরিট অফ ইসলামের প্রকাশনার এক শতাব্দীরও বেশি অতিক্রান্ত হয়েছে। এ দীর্ঘ সময়ে এ বইয়ের আবেদন ও মূল্য এতটুকু ক্ষুণ্ন তো হয়ইনি; উপরন্তু পাঠকের মনে এর প্রতিক্রিয়া আগের মতই তাজা ও রঙ্গিন হয়ে আছে। একজন লেখকের পক্ষে তার বইয়ের এরকম গণনন্দিত হওয়ার ঘটনা শুধু আমাদের দেশেই নয়, সারা পৃথিবীতেই দুর্লভ। এক শতাব্দীর রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ডামাডোল ও টানাপোড়েনের মধ্যে কত লেখকের খ্যাতির শরীরে জীর্ণতা স্পর্শ করেছে, পাঠকপ্রিয়তা হ্রাস পেয়েছে, কত বই স্মরণের অতীতে হারিয়ে গেছে; কিন্তু সৈয়দ আমীর আলীর সৌভাগ্য তাঁর কীর্তির মতই তাঁর এই অবিসম্বাদী গ্রন্থ আজও মুসলমানের হৃদয়কে সমানে উজ্জীবিত করে চলেছে।

১৮৯০ সালে যখন এ বই প্রথম প্রকাশিত হয় তখনই বোঝা গিয়েছিল এর লেখক কি চান আর কি তার উদ্দেশ্য। ইসলামের শক্তি মাহাত্ম্য বর্ণনা করার মধ্যে লেখক যে তার উদ্দেশ্য সীমিত করতে চাননি এটা স্পষ্ট; কারণ এ প্রয়োজন পূরণ করা লোকের অভাব সেদিন খুব একটা হয়নি। প্রয়োজন যেটা ছিল সেটা হলো জীবন্ত আর আধুনিক মননের। এই প্রয়োজন আর প্রাপ্তির দায় মেটানোর জন্য সৈয়দ আমীর আলীর কলম দিয়ে যে অগ্নিস্রাব উদ্‌গত হয়েছিল তার স্পর্শে ঘুমন্ত আর ঝিমন্ত মুসলমানের আত্ম উদ্বোধনের সূচনা হয়েছিল। যে বলিষ্ঠতা, গৌরবময়তা ও অকুতোভয়চিত্ততার আয়োজনের মধ্যে আমীর আলী এ বই রচনার শুভারম্ভ করেছিলেন, যে নির্ভীকতা ও আত্মময়তার দাবী নিয়ে জীর্ণপ্রাণ মুসলমানের কুটীরে দাঁড়িয়ে তিনি তাদের ইতিহাস সভ্যতা সংস্কৃতি উজ্জীবনের ঘোষণা দিয়েছিলেন এ বইতে সেটাই হচ্ছে দেখবার বিষয়।

আমীর আলী মুসলিম সভ্যতা ও ইতিহাসের উপর জোর দিয়েছেন। তার এই ইতিহাসপ্রীতি কখনো ইতিহাস বন্দনা হয়ে দাঁড়ায়নি। ইতিহাসের শক্তিকে আশ্রয় করে তিনি বর্তমানকে স্থিতিশীল করবার কথা বলেছেন। এ বইতে তিনি ইসলামের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তির কথা বলেছেন। এ সব শক্তি, তার ধারণা ইসলামী সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন উপাদান যার প্রাণস্বরূপে আছে এক তৌহীদভিত্তিক আদর্শ।

আমীর আলী তাঁর স্বকালে যে জীর্ণপ্রাণ ইসলামের চেহারা দেখেছিলেন তার কথা তিনি এ বইতে বলেননি। তিনি সেই ধর্মের কথা বলেছেন যার মাধ্যমে মানব প্রগতি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত হতে পারে। এর রূপায়ন কি করে সম্ভব?

যদি ইসলামের সাংস্কৃতিক শক্তিগুলো মন্থন করে মুসলমানরা বর্তমানের দুঃখব্যথার মর্মস্থলে বুক পেতে দাঁড়াতে পারে, যদি নিজের গৌরব গাথাকে বন্দনা না করে শক্তিতে পরিণত করতে পারে তবে মুসলমানরা আবার জগজ্জয়ী ভূমিকা পালন করতে পারবে। নিজের অতীতকে হারিয়ে ফেলার কারণে মুসলমানদের কি অবস্থা হয়েছে আমীর আলী সেটা খুব ভালো করেই বুঝেছিলেন। যার অতীত থাকে না, শিকড় আর মূল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সেত কালে কালে নিজের সম্পর্কেই সংশয়াপন্ন হয়ে পড়বে। নিজের ঐতিহ্য আর সৃষ্টিশীলতার


www.pathagar.com

উপর নিস্পৃহতার শেওলা জন্মাবে এতো খুব স্বাভাবিক। দি স্পিরিট অফ ইসলাম মুসলমানের সেই নির্বীর্যতা ও নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে এক বড় রকমের প্রতিবাদ।

ইসলামের গৌরব আদর্শ ও মহাত্ম্য এ বইয়ের প্রতিপাদ্য। কিন্তু যে ভঙ্গীতে, যে আঙ্গিকে এর লেখক তা প্রমান করার চেষ্টা করেছেন তা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। কোন হীনমন্যতার পাপ লেখকের মনে ঠাঁই পায়নি। তিনি যা বুঝেছেন, যা তিনি উপলব্ধি করেছেন তা অত্যন্ত অবিচলতা, নির্ভরতা ও বলিষ্ঠতার দাবী নিয়ে উচ্চারণ করেছেন। যে কালে আমীর আলী এ বই রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন সে সময় ইসলামের বিরুদ্ধে খৃস্টীয় জগতের অপপ্রচার পর্বত সমান হয়ে উঠেছিল। ইসলাম বলতেই পুরো খৃস্টীয় জগত বুঝত রক্তারক্তি, হানাহানি আর বহুবিবাহের এক ধর্ম। খৃস্টান জগতের এই রোষানল ও মলিনতার বিরুদ্ধে আমীর আলী ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষে প্রতিবাদের আওয়াজ তুলেছিলেন। সেই আওয়াজের অন্য নাম দি স্পিরিট অফ ইসলাম।

কিসে সমাজের মঙ্গল হবে, কিসে ক্ষীণপ্রাণ মুসলমানের জন্য হিতকরী কিছু করা যাবে এ নিয়ে আমীর আলী কম সাধনা করেননি। তাঁর দীর্ঘ জজিয়তি জীবন, রাজনৈতিক জীবন আর লেখক জীবনের আবেষ্টনী অতিক্রম করে তাঁর সহানুভূতিপ্রবণ ও সৃষ্টিশীল মনের যে ছায়া এ বইয়ের পিছনে দেখতে পাচ্ছি, যে ভাবুকতা, মননশীলতা ও প্রাণময়তার তরুলতা এ বইয়ের পাতায় পাতায় আনন্দে নৃত্য করছে তাতো স্বয়ং লেখকেরই জীবন সাধনার স্পন্দন মাত্র। ইসলামের মাহাত্ম্য তিনি আলোচনা করেছেন ঠিক কিন্তু সেই লক্ষ্যের সাথে আর একটি উদ্দেশ্য এ বইয়ে পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে চলেছে। মুসলমানের যে বর্তমান সমস্যা, লেখক তাদেরকে উচ্চগ্রামে বলতে চান এর উপযুক্ত সমাধান মিলতে পারে ইসলামের নীতি ও আদর্শের মধ্যে। প্রশ্ন হতে পারে এরকম কথাতো অনেকেই বলেছেন। তাতে আর বিশেষ কি মূল্য বহন করে; কিন্তু কথা হলো আমীর আলী যে ভাবে বলেছেন তা এক দ্রষ্টার সমুন্নত দৃষ্টিভূমির উপর দাঁড়িয়ে বলেছেন এবং এই উচ্চগ্রামে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার যোগ্যতা অবশ্যই আমীর আলীর ছিল।

লেখক এ বইয়ে বলেছেন ইসলাম যখন নবী মুহাম্মাদ (স) এর হাত দিয়ে প্রচারিত হয় তখন অন্য কোন ধর্মেরই পৃথিবীর সমস্যা মোকাবেলা করার মতো জীবনীশক্তি অবশিষ্ট ছিল না। তিনি যে যুক্তি তর্কের অবতারণা করেছেন, যে ঐতিহাসিক প্রমাণমালা হাজির করেছেন তা অনেকের কাছে মেনে নেয়া কষ্টকর হতে পারে কিন্তু তাঁর বক্তব্যের ভিত্তি যে মোটেই ঠুনকো নয় সে কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। আর ইসলাম যে সভ্যতার চাকাকে অনেকখানি ঘুরিয়ে দিয়েছিল, মানবজাতির অনেক উন্নতি-প্রগতির সূচনা ইসলাম অনুসারীদের হাত দিয়েই আরম্ভ হয়েছিল তা কি মিথ্যা কথা? এরকম কথা শুধু আমীর আলী একা বলেননি, অনেক অমুসলিম মনীষীরাও স্বীকৃতি দিতে তৃপ্তি বোধ করেছেন। আমাদের কাছের মানুষ বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা মানবেন্দ্রনাথ রায়তো ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান (Historical role of Islam) নামে সুন্দর একটা বই লিখে ফেলেছিলেন। সে বইয়ের একটা বিখ্যাত উদ্ধৃতি হলো The revolt of Islam saved humanity। যে যুক্তি


www.pathagar.com

বলে এম, এন, রায় এ কথা বলতে পেরেছিলেন তার পিছনে ইসলামকে বুঝবার তার এক চমৎকার মন কাজ করেছিল। এমন মনে করার কারণ নেই তিনি শুধু ইসলামের সফলতার চিত্রগুলোই এঁকেছেন, তার দৃষ্টিতে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে ইসলাম কোথায় ব্যর্থ হয়েছে তাও তিনি বিবেচনায় এনছেন। কিন্তু এখানে ভেবে দেখবার বিষয় হলো, যে মনোভংগীতে তিনি ইসলামকে বুঝবার প্রয়াস চালিয়েছেন তাতে তার যুক্তির ইন্দ্রিয়গুলো যে খুব সচল ছিল তা বলাই বাহুল্য। এম, এন, রায় আমীর আলীর এ বই সম্বন্ধে কতটুকু জানতেন তা স্পষ্ট নয়। তবে তাঁর মতো বিদ্বান, বুদ্ধিমান আর দৃষ্টিমান ব্যক্তির জন্য এ বই যে খুব উপাদেয় হতে পারতো তা ভাবা যেতে পারে।

আর যে কথাটা আমীর আলী বিশেষ জোরের সাথে এ বইয়ে বলতে চেয়েছেন সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ইসলামের শক্তির উপাদানগুলো বিন্যস্ত করতে যেয়ে তিনি এর মানবিক দিকটা অত্যন্ত পরিচ্ছন্নভাবে তুলে ধরেছেন। ধর্ম যদি মানুষের কল্যাণ না করতে পারে শক্তি না যোগাতে পারে তবে সে ধর্ম ক্রমে আচার সর্বস্ব কতকগুলো প্রথায় পর্যবসিত হয়। আমীর আলী বলেছেন ইসলাম মানুষের কল্যাণের ধর্ম, প্রগতির ধর্ম, এর নীতি নিয়ম এবং কার্যপ্রণালী সম্পূর্ণভাবে মানবতাকেন্দ্রিক। জীবন উপবাস নয়, জীবন বৈরাগ্য নয়; জীবন কতকগুলো নীতি নিয়মের সমষ্টিও নয়। জীবন হচ্ছে অনন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ। এই জীবনকেই সার্থকতায় বিমন্ডিত করতে হলে চাই শুদ্ধতার অনুশীলন আর মানবিকতার চর্চা। ইসলাম সে পথেরই সন্ধান দিয়েছে। এ বইয়ের The religious spirit of Islam অধ্যায়ের কয়েক ছত্র উদ্ধৃতির লোভ সম্বরণ করতে পারছি না–

> It was declared that prayer without "The presence of the heart" was of no avail, and that God's words which were addressed to all mankind and not to one people, should he studied with the heart and lips in absolute accord.

এই যে কথা, হৃদয়ের সাথে প্রার্থনার যোগ, হৃদয়ের সাথে ওষ্ঠের মিত্রতা এর উপরে একটু জোর দিতে চাই। এর মধ্যেই ধ্বনিত হয়েছে ইসলামের মূল সুর। মানুষকে তার সাধনায় পূর্ণতা অর্জনের জন্য চাই এই বলীয়ান হৃদয়। আল্লাহতায়ালার বাণী সকল মানুষের জন্য, কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষের চাহিদা আর প্রয়োজন পূরণ করার জন্য নয়। সর্বান্তকরণে সে বাণীর তাৎপর্য গ্রহণ করার দায়িত্ব তাই মানুষের তেমনি বর্জন করার দায়ও মানুষের। ইসলামের এই বৈশ্বিক ব্যাখ্যায়নে আমীর আলীর সাফল্য এখনও প্রায় একমে বা দ্বিতীয়ম। অনাগত কালের পাঠকের কাছে এ বইয়ের আবেদন এখানেই।



www.pathagar.com

# নওয়াব আবদুল লতিফ স্মরণে

নওয়াব আবদুল লতিফের ইন্তেকালের পরে ১০৬ বৎসর গত হলো। এই দীর্ঘ সময়ে তাঁর জন্মভূমি বাংলাদেশে এবং তাঁর স্বধর্মী বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে এই কর্মবীরের জীবন সাধনার মূল্য যে ভাবে নিরূপিত হবার কথা ছিল তার ছিটেফোটাও হয়েছে বলে মনে হয় না। বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের দুর্ভাগ্য তারা তাদের অতীতকে অতি সহজেই ভুলে যায়। যার প্রয়াস ও প্রচেষ্টার ফলে বাঙ্গালী মুসলমানের নব প্রবর্তনার যুগ শুরু হয়েছিল, যার চিন্তাদর্শ ও কর্মধারা বাঙ্গালী মুসলমানের জীবন গঠনে গভীর গ্রাহী ভূমিকা রেখেছিল তাকে বিস্মৃতির অন্ধকারে ঠেলে দিয়ে আমরা কোন সর্বনাশের আয়োজনে মেতে উঠেছি তার বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নেই।

নওয়াব আবদুল লতিফকে বলা যায় বাঙ্গালী মুসলিম নব জাগরণের প্রভাত সূর্য। তাঁর সাধনা ও অপার কর্মনিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তিনি যে বিরাট নব আদর্শ জাতির সামনে উপস্থাপন করতে পেরেছিলেন এই শত বৎসরে আমাদের দেশে তার সঙ্গে তুলনীয় হতে পারেন এমন সংখ্যা অবশ্যই খুব বেশি নয়। তার সমসাময়িক কালে প্রতিবেশী হিন্দু সমাজে তার মত সমাজ সেবক ও কর্মীর সংখ্যা একেবারে নগণ্য ছিল না। কিন্তু নওয়াব আবদুল লতিফকে বাঙ্গালী মুসলমানের হয়ে সেই দায়িত্ব একাই কাঁধে তুলে নিতে হয়েছিল।

নওয়াব আবদুল লতিফ যে পাশ্চাত্য শিক্ষা, জ্ঞান বিজ্ঞান ইত্যাদির দিকে যথেষ্ট শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি তাঁর স্বধর্মীদের কাছে অবিরাম এই আবেদনই করেছিলেন ইংরেজী শিক্ষায় পাকা না হয়ে উঠলে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলা যাবে না এবং সেই সাথে রাজকার্যেও ন্যায্য ভাগ পাওয়া যাবে না।

নওয়াব আবদুল লতিফের এই পাশ্চাত্য প্রীতি আজকে আমাদের অনেকের কাছে দৃষ্টিকটু মনে হতে পারে কিন্তু তাকে যদি আমরা যুগধর্মের আলোকে বিবেচনা না করি তবে তাঁর প্রতি আমাদের ন্যায় বিচার হবে না। নওয়াব আবদুল লতিফ যখন তাঁর স্বধর্মীদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের জন্য সংগ্রাম করছিলেন তখন বাঙ্গালী মুসলমানদের অবস্থানটা কি ছিল তা অবশ্যই জেনে নেয়া দরকার।

পলাশীর বিপর্যয় ও ইংরেজের ক্ষমতারোহনের পথ ধরে উনিশ শতকের প্রথম দিকে এসে মুসলমানরা পরিণত হয়েছিল হান্টার সাহেবের ভাষায় রংমিস্ত্রী ও ভিস্তিওয়ালার জাতিতে (Hewers of wood and drawers of water)। মুসলমানদের রাজনৈতিক অবস্থান একবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। রাজভাষা ফার্সী উঠে যাওয়ায় মুসলমান শিক্ষিত শ্রেণী যারা সরকারী চাকরীতে নিয়োজিত ছিল, রাতারাতি বেকার হয়ে পড়লো এবং অর্থনৈতিক বিন্যাসের দিক দিয়ে তারা সমাজের নীচু স্তরে চলে এলো। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে বৃটিশ সরকার মুসলমান অভিজাত শ্রেণীকেও নিঃশেষ করে দিল। ব্যবসা, বাণিজ্য যা এতকাল নিয়ন্ত্রণ করতো মুসলমানরা তা ছিনিয়ে নিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। আর শিক্ষার দিক দিয়ে বিবেচনা করলে বলতে হয় রাতারাতি ইংরেজের রোষানলে পড়ে মুসলমানরা একটা অশিক্ষিত জাতিতে পরিণত হলো। এর উপরে চলছিল মুসলমানদের স্বাধীনতাকামী তৎপরতা। ইংরেজ শাসন উৎখাত করবার জন্য সমস্ত উপমহাদেশব্যাপী তারা জেহাদ আন্দোলন জাগিয়ে রেখেছিল। এ সব ঘটনা ইংরেজ শাসক ও কর্মকর্তাদের আরো বেশি করে মুসলমানদের প্রতি সন্দিগ্ধ ও বৈরী করে তুলেছিল। ফলশ্রুতিতে মুসলমানদের উপর ইংরেজ শোষণ ও জুলুমের তীব্রতা ভীষণাকার ধারণ করেছিল।



www.pathagar.com

এই অকাল দুর্যোগের দিনে নওয়াব আবদুল লতিফ মনে করেছিলেন ভারতে ইংরেজ শাসন যেহেতু দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে তাই তাদের মোকাবেলা করতে যাওয়া মুসলমানদের পক্ষে এই মুহূর্তে বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। মুসলমানদের উচিত তাদের নীতির পরিবর্তন করে নতুন পরিস্থিতিতে ইংরেজের সাথে সহযোগিতামূলক সম্বন্ধ গড়ে তোলা এবং ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের সমৃদ্ধিকে নিশ্চিত করা। নওয়াব আবদুল লতিফ নিজের ইংরেজ আনুগত্য বজায় রেখে সেদিন মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ফলশ্রুতিতে তিনি ইংরেজ শাসকদের কাছ থেকে মুসলমানদের জন্য কিছু অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা আদায় করতে সমর্থ হন। নওয়াব আবদুল লতিফের বক্তব্য ছিল মুসলমানরা আরবী ও ফারসীর পাশাপাশি ইংরেজী শিক্ষা লাভ করুক। এতে তারা বৃটিশ শাসনের শক্তি ও চমৎকারিত্ব উপলব্ধি করতে পারবে এবং তা তাদের শান্তি ও সমৃদ্ধির সহায়ক হবে। মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারে তাঁর উদ্যম ও উৎসাহের বিবরণ আমরা পাই তার লেখা A short account of my humble efforts to promote education specially among the Mohamedans গ্রন্থে।

মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নে তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয়েছে এ কথাও তিনি এ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেনঃ To the cause of the education of the natives in general and Mohamedans in particular, I have devoted the best years of my life.

নওয়াব আবদুল লতিফের বেশির ভাগ মনোযোগ সচেষ্ট ছিল কোলকাতা ও হুগলী মাদ্রাসার ভগ্নদশার উন্নয়ন ঘটিয়ে সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর প্রয়াসের মধ্যে। নওয়াব আবদুল লতিফের অন্য আর একটি অবদান হচ্ছে মহসীন ফান্ডের টাকার যথাযথ ব্যবহার করে মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারে সহায়তা করা। এতকাল মহসীন ফান্ডের টাকায় হুগলী কলেজের ব্যয় নির্বাহ করা হতো। সেখানে মুসলমান ছাত্র অপেক্ষা হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা বেশি ছিল। নওয়াব আবদুল লতিফের পরামর্শে সরকার মহসীন ফান্ডের টাকা বাঁচিয়ে রাজশাহী, ঢাকা, চট্টগ্রামে মুসলমান ছাত্রদের জন্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ ছাড়া এ টাকায় হুগলী, রাজশাহী, ঢাকা, চট্টগ্রামে মুসলমান ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস নির্মিত হয় এবং ছাত্রদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়। মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতির ব্যাপারে নওয়াব আবদুল লতিফ বিভিন্ন সময় সরকারকে নানাভাবে উপদেশ দিতেন। এ উপদেশের আলোকে সরকার দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলমান ছাত্রদের বেতন দুই তৃতীয়াংশ মওকুফ করেন এবং নয়টি জেলা স্কুলে ফারসী শিক্ষক নিযুক্ত করেন। এসব কর্মসূচীর ফলে দরিদ্র মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষালাভের পথ অনেকখানি সহজ হয়।

আবদুল লতিফের চেষ্টায় ১৮৫৩ সালে হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তরিত হয় এবং মুসলমান ছাত্ররা উচ্চ ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ পায়। এর আগে এ কলেজে একমাত্র হিন্দুরাই লেখাপড়ার সুযোগ পেত।

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী প্রণয়নে এবং কেন্দ্রীয় স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের সদস্য হিসেবে গ্রন্থ নির্বাচনে আবদুল লতিফ মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। পাঠ্য বইয়ের বিভিন্ন রচনায় হযরত মোহাম্মদ (স) ও ইসলাম সম্পর্কে অনেক আপত্তিকর মন্তব্য আছে এ যুক্তি দেখিয়ে এগুলো পাঠ্যসূচী থেকে তিনি বাদ দেয়ার জোরালো সুপারিশ করেন। তিনি এ প্রসঙ্গে এ কথাও বলেন, পাঠ্যসূচীতে ইসলাম ও মুসলমান বিরোধী অংশ থাকায় মুসলমান ছাত্রদের ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে।



www.pathagar.com

এ ছাড়া উচ্চ শিক্ষায় দরিদ্র ছাত্রদের আর্থিক সাহায্য দেয়ার জন্য বিত্তবানদের উৎসাহিত করে তিনি কতকগুলো বৃত্তি ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছিলেন।

মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবার জন্য তিনি বিভিন্ন সময় প্রবন্ধ নিবন্ধও লিখেছেন। 'এ মিনিট অন হুগলী মাদ্রাসা' 'এ পেপার অন মোহামেডান এডুকেশন' 'এ পেপার অন প্রেজেন্ট কন্ডিশন অব দি ইন্ডিয়ান মোহামেডানস এন্ড দি বেস্ট মীনস ফর ইটস ইমপ্রুভমেন্ট' 'হান্টার কমিশনকে প্রদত্ত প্রশ্নোত্তর' প্রভৃতি রচনায় আবদুল লতিফের শিক্ষা সম্পর্কিত চিন্তা ভাবনার বিবরণী দেখতে পাওয়া যায়।

আবদুল লতিফ আধুনিক ইংরেজী শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষার সমন্বয় চেয়েছিলেন বলে মনে হয়। ধর্মীয় শিক্ষা নৈতিক উন্নতির জন্য এবং ইংরেজী শিক্ষা জাগতিক উন্নতির জন্য তিনি প্রয়োজনীয় বিবেচনা করেছিলেন। এ কালের মত সেকালেও মুসলমান নেতৃবৃন্দের কেউ কেউ মাদ্রাসা শিক্ষা তুলে দিয়ে পুরোপুরি আধুনিক কলেজ করার পক্ষপাতি ছিলেন। নওয়াব আবদুল লতিফ মোহামেডান লিটারারী সোসাইটির সভা করে এসবের প্রতিবাদ করেছিলেন। হুগলী মাদ্রাসার রিপোর্টে আরবী ফারসী শিক্ষার সপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে নওয়াব আবদুল লতিফ বলেছিলেন ঃ

যতক্ষণ পর্যন্ত না একজন মুসলমান আরবী ও ফারসীতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে পারবে, মুসলমান সমাজে ততক্ষণ পর্যন্ত তার জন্য কোন সম্মানজনক স্থান সৃষ্টি হবে না। অন্য কথায় সমাজে শিক্ষিত হিসেবে সে কোন মর্যাদার আসন দখল করতে পারবে না এবং এই অবস্থা সৃষ্টি না হওয়ার কারণে মুসলমান সমাজে তার প্রভাবও অনুপস্থিত থাকবে। অন্যপক্ষে একজন মুসলমান যদি আরবী ও ফারসী না শিখে শুধু ইংরেজী শিক্ষা প্রাপ্ত হয় সেক্ষেত্রে তার পক্ষে সেই শিক্ষার সুফল নিজ সমাজের কাছে পৌছানো কষ্টসাধ্য হয়ে উঠবে। কিন্তু যদি সে আরবী ও ফারসীর পাশাপাশি ইংরেজীও আয়ত্ত করতে পারে তবে তার পক্ষে যেমন সমাজে প্রভাব বিস্তারের সুবিধা হবে তেমনি সরকারের স্বার্থে নিজের প্রভাবকে ব্যবহারের সুযোগও সৃষ্টি হবে। আমার মতে তাই সরকারের উচিত আরবী ও ফারসীর পাশাপাশি মুসলমানদের জন্য ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা।

আবদুল লতিফ মুসলমানদের শিক্ষার মাধ্যম কি হবে তা নিয়েও কিছু চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন। ১৮৮২ সালে হান্টারের শিক্ষা কমিশনের কাছে পাঠানো পরামর্শ পত্রে সাধারণ বাঙ্গালী মুসলমানের জন্য শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা বলে অভিমত জ্ঞাপন করেন এবং উচ্চবিত্ত মুসলমানদের জন্য শিক্ষার মাধ্যম হবে উর্দু এই মত তিনি পোষণ করেন। বাঙ্গালী মুসলমানের বাংলাকে তিনি সংস্কৃত প্রভাবমুক্ত ও আরবী-ফারসী প্রভাবপুষ্ট হতে হবে বলে মতামত দিয়েছিলেন। ভাষা ও শিক্ষা সম্পর্কে তার এই ধারণার পিছনে তার যুগ ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব স্পষ্ট। পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও সভ্যতার সাথে মুসলমানদের পরিচয় করিয়ে দেবার পাশাপাশি মুসলমানদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আবদুল লতিফের সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে মোহামেডান লিটারারী সোসাইটির প্রতিষ্ঠা। ১৮৬৩ সালের ২রা এপ্রিল কোলকাতায় সংস্থাটির আত্মপ্রকাশ ঘটে।

মোহামেডান লিটারারী সোসাইটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে নওয়াব আবদুল লতিফ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন–

Being fully aware of the prejudices and exclusiveness of the Mahomedan community, and anxious to imbue its members with a desire to interest themselves in western learning and progress and to give them an opportunity for the cultivation of social and intellectual



www.pathagar.com

intercourse with the best representatives of the English and Hindoo society, I founded the Mahomedan Literary society in April, 1863, which by its meetings, lectures and annual conversaziones held at the Town Hall, has done a great deal to quicken the Mahomedan intellect and lead it on the path of advancement, besides constituting a consultative body for advising Government on all occasions where in Mahomedan interests may be concerned.

মূলত মোহামেডান লিটারারী সোসাইটিকে আবদুল লতিফ শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও গবেষণার, চিন্তার ও চর্চার কাজে লাগিয়েছিলেন। সোসাইটির নিয়মিত সভাগুলোতে সদস্যরা শিক্ষা, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন, প্রবন্ধ পাঠ করতেন। এসবের উপর নানা যুক্তিপূর্ণ মতামতও দিতেন। সোসাইটির এরকম একটা নিয়মিত সভায় স্যার সৈয়দ আহমদ খান কোলকাতায় এসে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তার উপর একটা প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন।

এ ছাড়া সোসাইটি সে সময়কার সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ও ভাইসেরয়দের আগমন ও বিদায়ের কালে যথাযথ অনুষ্ঠান করে মুসলমানদের দাবী দাওয়া তুলে ধরার কৌশলও গ্রহণ করেছিল। এ সোসাইটির মাধ্যমে নওয়াব আবদুল লতিফ মুজাহিদ আন্দোলণের ফলে মুসলমান সমাজে ইংরেজ রাজত্ব সম্বন্ধে যে বিরূপ ধারণা গড়ে উঠেছিল তা দূর করারও চেষ্টা করেছিলেন। মুজাহিদ আন্দোলন প্রভাবিত মুসলমানরা ইংরেজ শাসনকে অনৈসলামী মনে করত। তারা ভারতকে দারুল হরব ঘোষণা করেছিল এবং তারা মনে করত জেহাদের মাধ্যমে ইংরেজ রাজত্ব উৎখাত করাই হলো মুসলমানের ধর্মীয় দায়িত্ব। এ কথা সত্য মুজাহিদদের ইংরেজ বিরোধী সংগ্রাম তখন একটা ধর্মীয় চারিত্র্য পেয়েছিল।

নওয়াব আবদুল লতিফ মনে করেছিলেন জেহাদ আন্দোলন যদি চলতে থাকে তাহলে মুসলমানরা শক্তিশালী প্রতিপক্ষ ইংরেজের সাথে লড়াই করে টিকে থাকতে পারবে না। তাই তিনি ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীতেই এর মোকাবেলার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি অন্য আর একদল আলেমের সহায়তায় এই মর্মে একটি ফতওয়া সংগ্রহ করেন যাতে বলা হয়েছিল বৃটিশ শাসিত ভারত দারুল হরব নয়; সুতরাং ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মুসলমানের ধর্মীয় দায়িত্বও নয়।

১৮৭০ সালের ২৩শে নভেম্বর মোহামেডান লিটারারী সোসাইটির সভায় আবদুল লতিফ, মৌলভী কারামত আলী জৌনপুরীকে আমন্ত্রণ জানান; এ সভায়ই তিনি উপরোক্ত মতামত পোষণ করেন। নওয়াব আবদুল লতিফের এই প্রয়াস ও প্রচেষ্টা অনেকের কাছে সেদিন প্রীতিকর না মনে হলেও এটা যে মুসলমানদের প্রতি ইংরেজ বৈরিতা অপসারণে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল তাও অস্বীকার করবার উপায় নেই।

আজ এতদিন পর নওয়াব আবদুল লতিফের স্মৃতি বাসরে শ্রদ্ধা ও ভক্তির এ কথাগুলো নিবেদনের অর্থ হলো আমরা এখন যেখানে পৌছেছি, যতটুকু গৌরব ও সমৃদ্ধি লাভ করেছি তার যাত্রাটা যে তাঁর হাত দিয়েই শুরু হয়েছিল এ কথাটা নির্বিবাদে মেনে নেয়া। তার সেদিনের যত প্রয়াস ও প্রচেষ্টার ফলে আজ বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যে যে সাধনা ও সম্ভাবনার ছবি স্পষ্টতর হয়ে উঠছে, নব নব সার্থকতার পথে তারা প্রেরণা লাভ করছে সে কথা বলাই বাহুল্য। তাঁর সযত্ন প্রয়াসে ভ্রান্তি থাকতে পারে, কিন্তু আন্তরিকতার যে মোটেও ঘাটতি ছিল না এটা বুঝবার সময় এসেছে। আশা করি দেশ তার পরম নির্ভরযোগ্য কল্যাণ সাধকের মর্যাদা বুঝতে পারবে।



www.pathagar.com

# বাংলা ভাষার ইসলামী শব্দ

১.

বাংলা ভাষার ইসলামী শব্দের বিরুদ্ধে বরাবরই এদেশের একটা প্রতিক্রিয়াশীল ও অবনত চিন্তার ব্যবসাদার গোষ্ঠী ক্রুসেড চালিয়ে এসেছেন। হাল আমলে জ্ঞান-বিজ্ঞান আর আধুনিকতার এই যুগে এসেও এইসব কুপমন্ডুক ক্রুসেডেকাররা তাদের জীবনী শক্তি হারিয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে নেই। বরং সুযোগ পেলেই তুমুল আয়োজনে এ দেশের মুসলিম ইতিহাস আর ঐতিহ্যের যেটুকু নিদর্শন টিকে আছে তা কেটে কুটে সাফ করে ফেলাই তাদের জীবনের পরম লক্ষ্য ও ব্রত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতার সূচনা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কাল থেকে। ইংরেজের পরম আনুকুল্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় এই কলেজের আঙ্গিনায় বসে বাংলা সাহিত্যকে মুসলমান মুক্ত করার খৃষ্টান পাদ্রী ও হিন্দু পন্ডিতের যৌথ ষড়যন্ত্র ও প্রতিরোধের কাহিনী পুনরুল্লেখ করা এখন বাহুল্য মাত্র। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষণায় পন্ডিত আর পাদ্রীর এই যুগ্ম ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল সাংস্কৃতিকভাবে বাঙ্গালী মুসলমানদেরকে পঙ্গুত্বের শিকার হতে বাধ্য করা এবং ভাষা ও সাহিত্যের জগত থেকে তাদেরকে নির্মূল করে দেয়া। তাদের এ চেষ্টা কতকটা সফল হয়েছিল বলা চলে। এতকাল মুসলমান জীবনে যে সৃষ্টিশীলতার জোয়ার প্রবাহিত হতো, ইংরেজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তা কেমন যেন বন্ধ্যা হয়ে গেলো। অন্যদিকে হিন্দু কবি সাহিত্যিক ঔপন্যাসিক নানা সৃষ্টিশীলতা ও অভিনবত্বের মধ্যে নিজেদের কৃতিত্ব দেখালেন; অবশ্য তা ছিল হিন্দু ঐতিহ্যের কাঠামোকে আশ্রয় করে। নবজাগ্রত এই হিন্দুবাদীদের নিকট হিন্দু ও মুসলমান বাঙ্গালীর যৌথ সংস্কৃতি তেমন গুরুত্ব পায়নি। বাঙ্গালী সংস্কৃতি বলতে যৌথ সংস্কৃতির উপর জোর দেয়া হলেও উনিশ শতকের বাঙ্গালী সাহিত্য ব্রতীদের সৃষ্টিতে তার কোন লক্ষণ নেই। ইশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিম, ভূদেব, দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রমুখের সৃষ্টিতে যৌথ সংস্কৃতির লক্ষণজাত উপাদানের চেয়ে সেই সংকীর্ণ হিন্দু কাঠামোর কোঠাটা অনেক বড়।

উনিশ শতকের হিন্দু সাহিত্যিকরা মোটের উপর সবাই সচেতন ও অবচেতন উভয়ভাবেই তাদের নিজ নিজ সৃষ্টিতে সংস্কৃত বহুল শব্দ ব্যবহার করেছেন, আরবী ফারসী শব্দ এড়িয়ে গেছেন। সবচেয়ে বড় কথা তাদের সৃষ্টিতে হিন্দুত্বের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে তাদের সৃষ্টি সমস্ত হিন্দু মুসলমান বাঙ্গালীর কতটুকু যৌথ সম্পদ হতে পেরেছে তা বিতর্ক সাপেক্ষ হয়ে আছে। এই এত কিছুর পরেও তাদের পক্ষে বাঙ্গালী সংস্কৃতির প্রতীক হয়ে উঠতে কোন অসুবিধাই হয়নি। অন্যদিকে উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ মুসলমান ঔপন্যাসিক মীর মোশারফ হোসেন যখন সংস্কৃত বহুল অথচ লালিত্যপূর্ণ ভাষায় বিষাদ সিন্ধু রচনা করলেন তখন বঙ্কিচন্দ্রের ব্যাঙ্গোক্তি লক্ষ্যণীয়ঃ এই লেখকের রচনায় পেয়াঁজ রসুনের গন্ধ বেশি পাওয়া যায় না।

স্পষ্টতঃই বঙ্কিম সেদিন আরবী ফারসী শব্দের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন। এরকমভাবে যে সব মুসলমান কবি সাহিত্যিকরা সেকালে তাদের সৃষ্টিতে আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছেন বা এখনও যারা করেন তাদেরকে বাঙ্গালী সংস্কৃতির শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করবার এক অশুভ ইচ্ছে দৃষ্টিগোচর হয়। তাদের কাছে হিন্দু ঐতিহ্যের অংশ সাম্প্রদায়িকতায় চিহ্নিত হয় না, চিহ্নিত হয় মুসলমান ঐতিহ্যের অংশ।



www.pathagar.com

২.

একটা শব্দ কখনো কখনো একটা সংস্কৃতির প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়, কখনো কখনো আত্মস্বাতন্ত্র্যের ধারাকে চিহ্নিত করে। এ সব শব্দ ছাড়া দেশ-কাল পাত্র ভেদে ঐ বিশিষ্ট সংস্কৃতিকে নির্দিষ্ট করা মুশকিল হয়ে পড়ে। যেমন ঈমান, নামায, রোযা, হজ্ব ও জাকাত। এ সব শব্দ মুসলিম সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এগুলোকে যদি বাংলা বা অন্য কোন ভাষায় তরজমা করতে যাওয়া হয় তবে তার ভাব ও ব্যঞ্জনা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবে এটাই স্বাভাবিক। অন্য একটা উদাহরণ দেয়া যাক। খ্রীস্টানদের একটা ধর্মীয় ঐতিহ্যের দিন হচ্ছে Good Friday। একে তরজমা করে যদি শুভ শুক্রবার বলা হয় তবে আক্ষরিক রূপান্তর হিসেবে এটি সঠিক হলেও এর ধর্মীয় ও ঐতিহ্যিক তাৎপর্য সনাক্ত করা যায় না।

সাহিত্যের সমস্যা হচ্ছে রূপের সমস্যা, রসের সমস্যা, শব্দের প্রয়োগ ও ব্যবহারের সমস্যা। ব্যবহারের গুণেই পুরনো কথাও নতুন শোনায়। এটাই সাহিত্য। সেখানে কে কি শব্দ নির্বাচন করলো সেটা বড় কথা নয়। নজরুল সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, ফররুখ আহমদ প্রমুখের সৃষ্টিতে অসংখ্য আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। এসব শব্দ সাহিত্যের রসকে ক্ষুণ্ন করেছে বলে কোথাও শোনা যায়নি। বিশেষ করে নজরুল ইসলাম তার স্বসমাজ ও স্বসংস্কৃতির দিকে নজর রেখে কবিতা ও গানে যে অসংখ্য আরবী ফারসী উর্দূ শব্দের শিল্প রসোত্তীর্ণ ব্যবহার করেছেন তা এক কথায় তুলনারহিত। এর ফলে তার সৃষ্টিতে মুসলমান সমাজের একটা চিত্র যেমন প্রতিবিম্বিত হয়েছে তেমনি বাংলা সাহিত্যও এ সব শব্দের ব্যবহারে নতুন গতিবেগ ও প্রানচাঞ্চল্য লাভ করেছে। নজরুল ইসলাম তার কান্ডারী হুশিয়ার কবিতার এক যায়গায় লিখেছিলেনঃ উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার। শোনা যায় রবীন্দ্রনাথ এই খুন শব্দের ব্যবহারে আপত্তি জানিয়েছিলেন। নজরুল ইসলাম তার প্রত্যুত্তরে লিখেছিলেন খুনের বদলে রক্ত যদি ব্যবহার করা হতো তবে ঐ কবিতার অন্তর্গত ভাব ও ঔজস্বিতা বহুগুণে নিঃশেষ হয়ে যেতো। আসলে এটাই হচ্ছে সাহিত্যের সমস্যা। কিন্তু এই সহজ সরল কথাটাই অনেক কবি সাহিত্যিক বুঝতে চান না। এখানেও কি কোন সাম্প্রদায়িকতা কাজ করে।

৩.

একজন শিল্পী যখন তার সৃষ্টির ডালি সাজিয়ে তোলেন তখন তার ভিতরে শিল্পীর স্বসমাজের কিছু চিত্র প্রতিফলিত হয়ে ওঠে এবং সেটাই স্বাভাবিক। সেটা যদি না হয় তবে সেই শিল্প হয়ে ওঠে উন্মূল, শিল্পীর মানসভাবনা বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হয়ে ওঠে বাস্তবতা নিরপেক্ষ ও দুর্নীরিক্ষ এক জগতাশ্রয়ী সম্পদ হিসেবে। প্রতিদিনের জীবনের সাথে এ সাহিত্যের সম্পর্কটা তাই কখনো নিবিড় হতে পারে না। ভালো সাহিত্যিককে তাই জীবননিষ্ঠ হওয়া চাই।

সাহিত্যের এই মূল্য বিচারের কথা মনে থাকলে বাংলা ভাষায় ইসলামী শব্দ ব্যবহারে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। আটশ বছর হলো ইসলাম এদেশে এসেছে। এই দীর্ঘ সময়ে নানা টানাপোড়েন আর উত্থান-পতনের মধ্যেও এদেশে মুসলিম সমাজ জীবনকে ঘিরে বিশেষভাবে মুসলিম সংস্কৃতির একটি বুনিয়াদ তৈরী হয়েছে। নতুন এই সমাজের প্রয়োজনেই সেদিন তাই ভাষার বিবর্তন ঘটেছে। সামাজিক উন্নতির সাথে সাথে ভাষারও প্রবৃদ্ধি ঘটে। নতুন এই সমাজের প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রেখেই তাই বাংলা ভাষায় অসংখ্য আরবী, ফারসী, তুর্কী ও উর্দূ শব্দ এসে মিশেছে। এটা একটা ভাষার চলিষ্ণুতার নিদর্শন। ভাষার এই



www.pathagar.com

গ্রহণযোগ্যতা না থাকলে সে ভাষা হয়ে পড়ে গতিহীন, মৃতপ্রায়। সেদিক দিয়ে বাংলা ভাষা সময়ের চাহিদা পূরণ করেছে বলতে হবে। শুধু ইসলামী শব্দ নয়, ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে এদেশের মানুষ যখন ইংরেজ, পর্তুগীজ, ফরাসী প্রভৃতি জাতির সংস্পর্শে এসেছে তখন এই সব ভিন্নদেশীয় শব্দাবলীও বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো বাংলা ভাষায় ইসলামী ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কিত শব্দগুলো ছাড়া ভিন্ন দেশীয় অন্য কোন শব্দের ব্যাপারে কোন আপত্তি ওঠে না। ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিম চন্দ্র থেকে শুরু করে বহু হিন্দু কবি সাহিত্যিক তাদের সাহিত্য সৃষ্টিতে দুর্বোধ্য সব সংস্কৃত শব্দের উপমা ও অলংকার ব্যবহার করেছেন, হিন্দু ধর্ম ও ঐতিহ্যকে নবজীবন দিয়েছেন, কই তখন তাদের বাঙ্গালীত্ব নিয়ে কখনোত প্রশ্ন ওঠেনি। আর কিছু মুসলিম কবি লেখকরা যখন তাদের সৃষ্টিতে ইসলামী শব্দের ব্যবহার করলেন, তাদের স্বসমাজ ও সংস্কৃতির প্রয়োজনেই এ সব শব্দের শিল্পোত্তীর্ণ ব্যবহার করে দেখিয়ে দিলেন যে এতে কোন সাহিত্য রসের ত্রুটি ঘটে না তখনই বিরাট প্রশ্ন উচ্চারিত হলো। এ মানসিকতাকে সাম্প্রদায়িকতা জাত বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না।

৪.

উনিশ শতকে পণ্ডিত আর পাদ্রীরা মিলে বাংলা সাহিত্য থেকে মুসলমান ঐতিহ্য নির্মূলের যে অভিযান শুরু করেছিলেন তার ধারা কিন্তু থেমে থাকেনি, আজও বহাল তবিয়তে চলছে। শুধু পাত্রের পরিবর্তন হয়েছে, পণ্ডিত আর পাদ্রীর স্থলে সে দায়িত্ব আজ ঘরের ছেলেরাই কাঁধে তুলে নিয়েছে। বাঙ্গালী সংস্কৃতি, জাতীয়তাবাদ ও চেতনার নামে এক বায়বীয় অস্তিত্বকে খাড়া করে তারা ক্রুসেড শুরু করেছে।

আগেই বলেছি ইতিহাসের ধারায় বাঙ্গালী সংস্কৃতি কখনোই হিন্দু মুসলমানের যৌথ সংস্কৃতি হিসেবে বিকাশ লাভ করতে পারেনি, সমস্ত উনিশ শতক জুড়ে যে বাঙ্গালী সংস্কৃতির চর্চা হলো তা এক হিন্দু জাতীয়তাবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। পরিণামে বিশ শতকের প্রথম দিকে মুসলমান সংস্কৃতি ও শিল্পকলার যে কথা শোনা গেলো তাও এক প্রকার মুসলিম জাতীয়তাবাদের জারকরসে সঞ্জীবিত হয়ে রইল। এই বিভক্ত সংস্কৃতি ভারত বিভাগের পথকেই প্রশস্ত করেছিল মাত্র।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর এই বিচ্ছিন্ন সংস্কৃতির হার জোড়া লেগেছে বলে অনেকে দাবী করেছিলেন, সে দাবী কতটুকু যৌক্তিক তা ভাববার বিষয়। পশ্চিম বাংলার বাংলাভাষী হিন্দুরা আজও বৃহত্তর ভারত সংস্কৃতির বুকে নিমজ্জিত হতেই পছন্দ করেন। হিন্দু মুসলমান বাঙ্গালীর যৌথ সংস্কৃতির দিকে তাদের মুখ আজ ফেরানো নেই। বাংলাভাষী হিন্দু মুসলমানের যৌথ সংস্কৃতির কথা বলে এদেশের বাঙ্গালীবাদীরা তাহলে কোন ষড়যন্ত্রের দিকে ইংগিত করেন?

৫.

জওয়াহেরলাল নেহরু তার বিখ্যাত 'ডিসকভারী অফ ইন্ডিয়া' গ্রন্থে একটি শব্দের ব্যবহার করেছেন Indianisation- ভারতীয়করণ। শব্দটির ব্যাখ্যায়নে নেহরু বলেছেন হাজার হাজার বছর ধরে ভারতীয় ভূখণ্ডে যে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর আগমন ঘটেছে কালক্রমে তারা ভারতের মাটি, মানুষ ও সংস্কৃতির মূলস্রোতের সাথে মিশে গেছে। মুসলমানরা ভারতে আসার আগে যে সব জনগোষ্ঠী ভাগ্যান্বেষণ ও উন্নততর সুযোগ সুবিধার আশায় ভারতে এসেছিল তারা স্থানীয় অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতার সামনে পরাভব মেনেছে। স্বভাবতঃই তারা ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে আত্মস্থ হয়ে গেছে। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি ছিল


www.pathagar.com

অন্যরকম। তারা নিয়ে এসেছিল একটি উন্নততর সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রেক্ষাপট, সামাজিক নিয়মকানুন ও আচার আচরণ। ফলে ভারতীয় সমাজ জীবনে মুসলমানরা নতুন মেহমান হয়ে এলেও তাদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে পূর্বাপর জাতিগোষ্ঠীর মত ধ্বংস করা সম্ভব হয়নি। পরিণতিতে স্থানীয় সমাজ কাঠামোর অংশীদার হয়েও ইসলামী সংস্কৃতি, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়। নেহরু তার বইয়ে আকবর ও কবীরকে ভারতীয়করণের উজ্জ্বল নজীর হিসেবে চিত্রিত করেছেন। এই দুইজনই বিশেষ করে আকবর তার নিজ ধর্ম বিশ্বাসকে বাদ দিয়ে স্বীয় চিন্তাপ্রসূত নতুন ধর্মমত নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন, মুসলমান ধর্ম বিশ্বাসের সাথে বৈদিক ও অন্যান্য সংস্কৃতির মিশ্রণে একটি জগাখিচুড়ী ধর্মমত চালু করে তিনি ভারতীয় ভূখণ্ডে সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা ভেবেছিলেন। এই সমন্বয়ের ধর্ম প্রচার করার পূর্বেই ঘটেছিল তার নিজ ধর্ম ইসলাম থেকে বিচ্যুতি। এই ডি-ইসলামাইজেসন (de-Islamisation) প্রক্রিয়ায় আকবর এবং কতকাংশে জাহাঙ্গীর ও দারাশিকো বৈদিক সংস্কৃতির অনেক কিছুই গ্রহণ করেছিলেন। নিজেরা হিন্দুপত্নী গ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি এমনকি আকবরের সময়ে হেরেমের অন্তরালে তার হিন্দু পত্নীরা পূজা অর্চনা করারও সুযোগ পেয়েছিল। এসব ঘটনাকে ভারতের হিন্দুরা অভিনন্দন জানিয়েছিল কেননা তারা দেখতে পেল মুসলমান মোঘল সম্রাটরা তাদের স্বীয় ধর্মবিশ্বাসকে বাদ দিয়ে মূলত হিন্দুধর্মের দিকেই এগিয়ে আসছে। ভারতীয় হিন্দুরা কখনোই মুসলমানদের অনুপ্রবেশকারী ও দখলদার শাসনকর্তার বেশি মনে করেনি, যদিও তারা এদেশের মাটি ও মানুষকে আপন করে নিয়েছিল। সম্মুখ সমরে পরাজিত হয়ে তাই তারা এই সাংস্কৃতিক সমরে লিপ্ত হয়েছিল এবং মোঘল সাম্রাজ্যের ইসলামী সংস্কৃতির ভিত দুর্বল করে দিতে চেয়েছিল।

মুসলমানের জন্য এটা আদৌ কোন সুখকর অনুভূতি ছিল না। বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আমলে মুজাদ্দেদ আল ফেসানী এই ডি-ইসলামাইজেসন প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধেই লড়াই শুরু করেছিলেন। তার এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল মূলত ভারতে মুসলমান সংস্কৃতিকে তার স্বকীয়তার আলোয় উজ্জীবিত করা।

নেহরুর ইন্ডিয়ানাইজেসনের মোদ্দা কথাই হলো সবকিছুকে Hinduise করা অর্থাৎ হিন্দুয়ানী ভাবাপন্ন করে তোলা। সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্মবিশ্বাস সবকিছুই এর অন্তর্ভূক্ত।

বাঙ্গালী, বাঙ্গালীত্ব কিংবা বাঙ্গালীকরণও মূলত নেহরুর ভারতীয়করণের ক্ষুদ্র ভৌগলিক সংস্করণ। সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে যদি ভারতীয়করণ বোঝানো হয় তাহলে বাংলাভাষাভাষীদের ক্ষেত্রে বাঙ্গালীকরণ কথাটা একই অর্থে এখন ব্যবহার করা যেতে পারে। বাঙ্গালী সংস্কৃতি ও চেতনার ধারকদের কর্মদৃষ্টে এখন মনে করবার যথেষ্ট সংগত কারণ আছে আমাদের জীবনে মুসলমানী সংস্কৃতির প্রতাপকে তারা ধীরে ধীরে নিঃশেষ করে দিতে চান। বাঙ্গালী সংস্কৃতি বলতে তারা শিকড়ের সন্ধানের কথা বলেন, দেশজ ও আবহমান সংস্কৃতির সন্ধান করেন। দেশজ সংস্কৃতি বলতে তারা এ ভূখণ্ডে যখন ইসলামের আবির্ভাব ঘটেনি সেই দিনের কথা ভাবতে চান। এ জাতির উদ্ভব কালের ইতিহাসকে মুছে দিয়ে ঐতিহ্যের শিকড় কেটে দিয়ে তারা বলতে চান ইসলাম পূর্বকালীন সমাজ ও সংস্কৃতির কথা। এটাকেই তারা নাম দিয়েছেন আবহমান বাংলার সংস্কৃতি। নেহরুর ইন্ডিয়ানাইজেসন ও বাঙ্গালীকরণের মধ্যে যোগসূত্রটা বোধ হয় এখানেই।


www.pathagar.com

৬.

বাঙ্গালী শব্দটা বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর পরিচয় জ্ঞাপক হলেও এর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য এখন আর আক্ষরিক অর্থের সীমানায় আবদ্ধ নেই। এর সাথে যুক্ত হয়েছে মুসলমানী ভাবধারা ও মূল্যবোধ বর্জিত এক ধরনের সাংস্কৃতিক চেতনা। এই চেতনাকে অত্যন্ত চতুরতার সাথে ব্যবহার করা হয়েছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অঙ্গনে। সংস্কৃতির প্রধান বাহন হলো ভাষা ও সাহিত্য। বাঙ্গালী সংস্কৃতির কর্মীরা তাই বাংলা ভাষাকে মুসলমানের কবলমুক্ত করবার জন্য এই ভাষার উপরই নবরূপে হামলা শুরু করেছেন সুকৌশলে। মধ্যযুগে ব্রাহ্মণ্যবাদের নিষ্ঠুরতা থেকে বাংলাভাষাকে বিপদমুক্ত করেছিলেন মুসলমান সুলতানেরা। তাদের উদার পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া বাংলাভাষার অস্তিত্ব রক্ষা হতো না। সেদিন শুধু হিন্দু-মুসলমানের অসামান্য সৃষ্টিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হয়নি, বাংলা ভাষায় অসংখ্য আরবী, ফারসী, উর্দু ও তুর্কী শব্দের প্রবেশের ভিতর দিয়ে বাংলা ভাষার উৎকর্ষ সাধনের ব্যাপারটাও সম্ভব হয়েছে। রেভারেন্ড উইলিয়াম গোল্ডস্যাক তার সম্পাদিত মুসলমানী বাংলার অভিধানে এরকম প্রায় ছয় হাজার শব্দের ব্যবহার দেখিয়েছেন যা এখানকার মুসলমানদের কথ্য জবানে ব্যবহার হয়ে থাকে। কয়েকটি নজীর দিচ্ছি ঃ তশতরী, শিরণী, তৌহীদ, দাওয়াত, কবুল, জালিম, দরিয়া, জাজিম, দহলিজ, দস্তরখানা, দফতর, ইশতেহার, গালিচা, দোয়াত, কালি, কলম ইত্যাদি। এ সব শব্দ মোটেই অপরিচিত নয় এবং শুনতেও অপ্রীতিকর মনে হয় না। এগুলো এখন বাংলা ভাষার মূলধারার সাথে এমন অবিমিশ্রভাবে মিশে আছে যে এটার উৎস বাংলা ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে এমন ধারণা করা বেশ কঠিন।

বাঙ্গালী সংস্কৃতিসেবীরা এ সব শব্দের ব্যবহার বন্ধ করতে চান, কখনো কখনো স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগুলো বিদায় করে দেয়ার কথা ভাবেন। এর বদলে তারা এমন সব শব্দ, শব্দবন্ধ, উপমা, উৎপ্রেক্ষা বাংলা ভাষায় চালু করতে চান যার উৎস বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির গভীরে প্রোথিত। প্রয়োজনানুসারে এ সব শব্দের ব্যবহার দুষণীয় নয়। দুষণীয় হচ্ছে একচোখা মানসিকতা, যে মানসিকতা সংস্কৃতির নামে মুসলমানী ঐতিহ্যকে পায়ে ঠেলে বিজাতীয় ঐতিহ্যকে কাছে টেনে নেয়।

ইদানীং একটি শব্দ প্রয়াত প্রায় অবাধে ব্যবহৃত হচ্ছে। মুসলমান সমাজে এ শব্দটা পুরোপুরি অপরিচিত ছিল। কোন মুসলমানের ইন্তেকাল হলে তার নামের আগে মরহুম শব্দ ব্যবহারের রেওয়াজ আছে। এখন মনে হচ্ছে আমাদের সমাজ থেকে এটি বিদায় নিতে চলেছে এবং তার স্থান দখল করতে যাচ্ছে প্রয়াত। আগেই বলেছি প্রত্যেক শব্দের আক্ষরিক অর্থের পাশাপাশি থাকে একটি সংস্কৃতিক দ্যোতনা। এই বিশেষ তাৎপর্য একটি সমাজের প্রবহমানতাকে ধারণ করে থাকে। মরহুম শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে আরবী রহম শব্দ থেকে। এর অর্থ অনুগ্রহ, আশীর্বাদ, করুণা ইত্যাদি। আমরা যখন কোন মৃত ব্যক্তির নামের আগে মরহুম শব্দটি ব্যবহার করে থাকি তখন তার সাথে আমাদের অন্তরের এক বিশেষ অনুভূতি উচ্চারিত হয়। আমরা বিশ্বাস করি মৃত ব্যক্তি আল্লাহর রহমতের ছায়ায় অবস্থান করছে। প্রয়াত শব্দ দিয়ে কি মরহুমের এই তাৎপর্য ধারণ করা চলে?

পরানুকরণ আসে হীনমন্যতা থেকে। মুসলমানী ঐতিহ্য সরিয়ে ভিন্ন কোন উৎসের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকার মধ্যে আমাদের হীনমন্যতার লজ্জাকেই প্রকাশ করে দেয়।



www.pathagar.com

# শিক্ষা সংকট

মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে তোলপাড় চলছে। কেউ বলছেন, মাদ্রাসা শিক্ষা যুগের প্রয়োজন মেটাতে পারছে না, তাই একে যুগোপযোগী করা চাই। কেউ আবার বলেছেন, মাদ্রাসা শিক্ষা হলো যাবতীয় অনগ্রসরতা, পশ্চাদপদতা ও মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতার নমুনা। তাই এ নমুনা শিকড়-বাকড়সহ তুলে ফেলাই বাঞ্ছনীয়। অদ্ভুত যুক্তি বটে।

মাদ্রাসা শিক্ষা ভূঁইফোড় কিছু নয়, যে রাতারাতি এটি গজিয়ে উঠেছে। এর রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস আর দীর্ঘতর ঐতিহ্য। এটি আমরা পেয়েছি আমাদের উত্তরাধিকার থেকে। এ দেশে ইসলাম আসার পর থেকেই এ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে আমরা বলতে পারি ইসলামী শিক্ষা। তার মানে জীবনের বহুবিচিত্র বিষয়ে ইসলামের যেমন একটা দৃষ্টভঙ্গী রয়েছে তেমনি শিক্ষা সম্পর্কেও এর রয়েছে বিশেষ মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণ। মাদ্রাসা শিক্ষায় ইসলামের সে দৃষ্টিভঙ্গী কিছুটা হলেও প্রতিফলিত হয়েছে। শত শত বছর ধরে এই যে মাদ্রাসাগুলো আমাদের দেশে টিকে আছে এর পিছনে জনগণের ভালবাসা ও প্রয়োজনের দায় একটা বড় রকমের কার্যকারণ হিসেবে কাজ করেছে। অন্যথায় এই ব্যবস্থা এতকাল ধরে টিকে থাকতে পারতো না। তাই যারা মাদ্রাসা শিক্ষাকে সেকেলে ও অচল বলে নিন্দা করতে চান তখন সেটা অনেকটা গালভরা উক্তির মতই শোনায়। কোন বুদ্ধিমান ও দৃষ্টিমান ব্যক্তির পক্ষে এটা করা সম্ভব নয়। অবশ্য যারা ধর্মের কথা শুনলে মুখ ফিরিয়ে নেন অথবা ধর্ম যাদের শিরঃপীড়ার কারণ হয়, তাদের কথা আলাদা।

এ দেশে যখন সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তার মানে সুলতানী আমল ও মোঘল আমলে মাদ্রাসা শিক্ষাই ছিল শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান ভিত্তি। মাদ্রাসা শিক্ষা বলতে এটা মনে করার কারণ নেই যে, এসব বিদ্যায়তনগুলোতে শুধুমাত্র কোরআন হাদীস পড়ানো হতো বরং জাগতিক প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রেখে দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলা, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়েও যুগোপযোগী পাঠক্রমের ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষা দেয়া হতো। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে যেমন আলেম ওলামারা বেরিয়ে আসতেন তেমনি রাজকার্যে, সরকারী উচ্চ পদে নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তিও এখান থেকেই তৈরী হতো। ঐতিহাসিক ডঃ মোহর আলী, ডঃ আব্দুর রহীম, ডঃ এ, আর মল্লিক প্রমুখের গবেষণা থেকে এটা আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়েছে, এদেশে মুসলমানরা আসার পর শিক্ষা ব্যবস্থার একটা শক্তিশালী ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ম্যাক্সমুলারের মত প্রথিতযশা জার্মান পণ্ডিত গত শতাব্দীতে স্বীকার করেছিলেন, বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার ত্রিশ বছর পূর্বেই আশি হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান ছিল। এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলতো মুসলমান সুলতান, আমীর ও রঈসদের অনুদান ও বিপুল পরিমাণ ওয়াকফকৃত সম্পত্তির অর্জিত অর্থ থেকে। সেকালে মসজিদ ছিল মুসলমানদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রস্থল। এই মসজিদকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠতো মক্তব। মক্তবগুলো ছিল আজকের দিনের ভাষায় প্রাথমিক বিদ্যালয়। আর মাদ্রাসাগুলো ছিল উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান। তার মানে আজকের দিনের


www.pathagar.com

সমানুপাতে কলেজ অথবা ইউনিভার্সিটি। পনের শতকের দিকে এরকম একটা উচ্চ শিক্ষার পীঠস্থান ছিল সোনারগাঁও। এখানকার প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ছিলেন আল্লামা শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা, যার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সেকালে সারা মুসলিম দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল।

মুসলমান আমলে বিকশিত হয়ে ওঠা এই শক্তিশালী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রথম এসে ধাক্কা খেলো ইংরেজ আমলে। সাম্রাজ্যবাদের প্রথম লক্ষ্য হিসেবে একটা শিক্ষিত জাতিকে কিভাবে রাতারাতি অশিক্ষিত করে দেয়া যায় তার সবরকমের চক্রান্ত ও কৌশল গ্রহণ করা হলো। মাদ্রাসাগুলোতে সরকারী অনুদান বন্ধ হয়ে গেলো। মাদ্রাসাগুলোর নামে ওয়াকফকৃত সম্পত্তিগুলো রাতারাতি হিন্দু জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হলো।

মাদ্রাসা শিক্ষা চূড়ান্তভাবে ধাক্কা খেলো ১৮৩৭ সালে যখন সরকার আইন করে অফিস আদালতের ভাষা ফারসীর স্থলে ইংরেজীর প্রবর্তন করলো। এতকাল সরকারী উচ্চ পদে নিয়োগ পেতে ফার্সী শিখতে হতো। মাদ্রাসাগুলোয় শিক্ষার অন্যতম মাধ্যম ছিল ফার্সী। নতুন আইনের ফলে মাদ্রাসাগুলো তার সামাজিক মর্যাদা হারালো।

রাজভাষার সম্মান হতে ফারসীর স্থানচ্যুতি ছিল মূলত শাসক গোষ্ঠীর সাথে কোলকাতার বাবু বুদ্ধিজীবীদের একটা গোপন আতাঁতের ফল। এ আতাঁতের ফলে সাম্রাজ্যবাদ মুসলমানদেরকে পুরোপুরি দাবিয়ে রাখার একটা মনপূত কৌশল খুঁজে পেলো। মুসলমানরা তখন সন্দেহ করেছিল নতুন ভাষা গ্রহণ করলে তারা দাসত্ব মনোবৃত্তি সম্পন্ন হয়ে পড়বে। তাই তারা প্রাথমিক অবস্থায় ইংরেজী ভাষার প্রতি একধরনের নিস্পৃহতা দেখিয়েছিল এবং তাদের সে আশংকা মোটেও অমূলক ছিল না। এটা মনে করার কারণ নেই যে, এদেশে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের কোন সদুদ্দেশ্য লুকিয়ে ছিল। বরং তারা তাদের সাম্রাজ্যিক বিস্তারকে সংহত করতেই এদেশে ইংরেজী শিক্ষা ও মূল্যবোধ প্রচারে সচেষ্ট হয়েছিল। এদেশে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের প্রধান বরকন্দাজ লর্ড মেকলের কয়েকটি মতামত এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। মেকলে সাহেব ছিলেন ভারতের জনশিক্ষা সাধারণ পরিষদের ডিরেক্টর। গভর্ণর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্কের পরামর্শে তিনি শিক্ষা সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। মেকলে ছিলেন পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা সম্পন্ন। তিনি তার রিপোর্টে এদেশের উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা দেয়ার কথা বলেছিলেন। তার প্রথম যুক্তি ছিল এ শ্রেণীকে শিক্ষা দিলে তারা পরে নিজেদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের সুযোগ সৃষ্টি করে নেবে। এটাই মেকলের ফিলট্রেশন থিওরী।

অন্য যুক্তিটি হলো ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তিত হলে বৃটিশ সরকারের রাজনৈতিক সুবিধা হবে। এতে ভারতীয়দের মধ্যে থেকেই এমন একটা দলের সৃষ্টি হবে যারা রক্তে ও বর্ণে ভারতীয় থাকবে কিন্তু চিন্তা, নীতিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিতে পুরোপুরি ইংরেজ হয়ে পড়বে। এরা সরকারের অনুগ্রহপ্রার্থী হয়ে আনুগত্য বজায় রাখবে।

কি সাংঘাতিক কথা! মেকলের এ কথাগুলো মনে রাখলেই বোঝা যাবে, কেন মুসলমানরা সে সময় ইংরেজী শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহ দেখিয়েছিল। আমাদের দেশের ইংরেজী শিক্ষিত সমাজে একটা বিরূপ ধরণা চালু আছে, মুসলমানরা নাকি তখন ইংরেজী শিক্ষা না নিয়ে ভুল করেছিল। তারা সেদিন যুগের পরিবর্তনের ধারাটি উপলব্ধি করতে পারেনি। অবশ্য আগে


www.pathagar.com

যুগের পরিবর্তন, যুগের প্রয়োজন শব্দগুলোর অর্থ বোঝা চাই। আরও বোঝা চাই কোন যুগে আমরা বাস করছি। আধুনিকতা আর যুগের পরিবর্তন বলতেই এখন আমরা বুঝি এক ধরনের পাশ্চাত্য নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অন্ধ অনুকরণ। এ হচ্ছে আমাদের দীর্ঘদিনের পরাধীনতাজনিত মন মানসিকতার ফল। এই মন মানসিকতার কারণেই মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি আমাদের দেশের কারো কারো মধ্যে আজকে বিরূপ ভাব এসেছে। মাদ্রাসা শিক্ষা বা ইসলামী শিক্ষাকে পাশে সরিয়ে রাখার একটা মনোবৃত্তিও সৃষ্টি হয়েছে। বৃটিশ আমলেই এ ধারণা চালু করা হয়েছিল যে, তাদের প্রবর্তিত শিক্ষা হচ্ছে আধুনিক শিক্ষা আর মাদ্রাসা বা ইসলামী শিক্ষা হচ্ছে সেকেলে বা প্রাচীন মডেলের শিক্ষা। বৃটিশের প্রচার করে যাওয়া সেই সাম্রাজ্যবাদী থিওরী আজও আমাদের দেশে অনেকেই সযত্নে লালন করে চলেছেন।

বৃটিশের প্রচারিত শিক্ষা ও মূল্যবোধ কোন অর্থে আধুনিক ছিল, আমাদের সমাজ ও জীবনের জন্য তা কতটুকু উপযোগী ছিল, এ সব প্রশ্নের উত্তর আজও আমরা পাইনি। তাদের প্রচারিত শিক্ষা ও মূল্যবোধ আমাদেরকে যে অনেকখানি আদর্শবিহীন করে ফেলেছে সন্দেহ নেই। দেশে আজ অনৈতিকতার মহামারী চলছে, মূল্যবোধের মহাবিপর্যয় শুরু হয়েছে; ঐতিহ্যের সাথে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে এগুলো যে কোন না কোন ভাবে তথাকতিত আধুনিক শিক্ষার ফল তা আশা করি কেউ অস্বীকার করবেন না এবং মেকলে সাহেবরাও এরকম কিছুই চেয়েছিলেন।

এজন্যই আমরা দেখেছি, বৃটিশ শাসনের একটা বিরাট অংশ জুড়ে ইংরেজী শিক্ষিত বিশেষ করে কোলকাতার বাবুরা ইংরেজ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য কিভাবে জানপ্রাণ দিয়ে খেটেছেন, অন্যদিকে নিঃস্ব দীন বাঙ্গালী মুসলমানের কষ্টার্জিত পয়সায় চলা মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে আসা আলেম ওলামারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রক্ত ঝরিয়েছেন। রায় বেরিলীর সৈয়দ আহমদ শহীদ থেকে শুরু করে বাংলাদেশের সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর এবং হাজীশরীয়তুল্লাহ সবাই ছিলেন মাদ্রাসা প্রত্যাগত। আলেম-ওলামাদের এই সংগ্রামী ঐতিহ্য সামনে থাকার পরও যদি মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি বিরূপতা দেখানো হয়, তবে তা হবে ইতিহাসের প্রতি একটা বড় রকমের অবিচার।

আগেই বলেছি, বৃটিশ আমলে এসে আমাদের দেশে কিভাবে দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার সূত্রপাত হলো। এর ফলাফল হিসেবে আমরা দেখলাম, দুধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা শিক্ষার্থীরা পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেলো এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বৈরিতা পোষণ করতেও শুরু করলো। সেটাই ছিল স্বাভাবিক এবং সাম্রাজ্যবাদের ইচ্ছাও ছিল তাই। এভাবে বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তার জগতে বিচ্ছিন্নতার বীজ ঢুকে গেলো এবং সেই বিচ্ছিন্নতাকে পুঁজি করে সাম্রাজ্যবাদ আজ অবাধ রাজনৈতিকভাবে না হলেও বুদ্ধিবৃত্তির জগতে এক ধরনের উপনিবেশ কায়েম করে রেখেছে। বাংলাদেশসহ মুসলিম দুনিয়ার প্রায় সর্বত্রই অর্থাৎ যেখানে যেখানে সাম্রাজ্যবাদের থাবা বিস্তৃত হয়েছিল সেখানেই এরকম দুধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। এর এক অংশে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক প্রবর্তিত আধুনিক শিক্ষা যেগুলো এখন আমাদের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রায় কোন পরিবর্তন ও সংশোধন ছাড়াই বহাল তবিয়তে চালু রয়েছে। শিক্ষার পিছনে একটা দৃষ্টিভঙ্গী থাকে এবং


www.pathagar.com

যেটা নাকি শিক্ষার্জনের সাথে সাথে শিক্ষার্থীর জীবনেও প্রতিফলিত হয়ে থাকে। এ ধরনের সাম্রাজ্যবাদ প্রবর্তিত 'আধুনিক' শিক্ষার সবচেয়ে বড় বিপদটা হচ্ছে এই দৃষ্টিভঙ্গীর। 'আধুনিক' শিক্ষা আমাদের শিক্ষার্থীদের পাশ্চাত্যকরণ, ধর্মনিরপেক্ষকরণ আরো পরিষ্কার করে বললে অমৈসলামীকরণের প্রক্রিয়া পুরোপুরি অব্যাহত রেখেছে এবং এই বিচ্যুতি প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থাই নেই। একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে সুবিধা হবে। ধরা যাক, একটা ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পলিটিক্যাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হলো। তার পাঠ্যসূচীতে যা আছে তা হলো পাশ্চাত্যের একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবিকল অনুকরণ। ফলে পাঠ্যসূচী সম্পূর্ণ করতে যেয়ে সে ভিন্ন দেশের বিশেষ করে পাশ্চাত্যের দেশগুলোর রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর ব্যুৎপত্তি অর্জন করে ফেললো। সে মিল পড়লো, বেন্থাম পড়লো, লাস্কি পড়লো। কিন্তু ইসলামের পলিটিক্যাল থিওরিটা জানতে পারলো না। কারণ তার সিলেবাসে এরকম কোন পেপারের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। ফলে এই ছেলেটার মনে একটা দৃষ্টিভঙ্গীর জন্ম হলো। সে দৃষ্টিভঙ্গীটা কি? সে ভাবতে শিখলো হয়ত এ রকম কোন ব্যবস্থা ইসলামে নেই অথবা থাকলেও পাশ্চাত্যের সামনে তা মোটেও Superior নয়।

এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা পার হয়ে বৃহত্তর সমাজে চলে এলো তখন কিন্তু তার মনে ইসলামের প্রতি এক ধরনের বিরূপতা বিস্তার লাভ করেছে এবং সে নিজে এমন এক আবর্তে প্রবেশ করেছে যার থেকে এখন তার বেরিয়ে আসা প্রায় অসম্ভব। ঔপনিবেশিক আমলের চেয়ে এ অবস্থাটা এখন আরো মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। তখনকার দিনে এই অবস্থা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য এক ধরনের প্রতিরোধ, বিকল্প সূত্রের সন্ধান অথবা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের একটা আকুতি ছিল। এখন এসবের কিছুমাত্র আর অবশিষ্ট নেই বললেই চলে। রাজনৈতিক নেতৃত্বের দেউলিয়াপনা, আদর্শহীনতা ও নৈতিক অধপতন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, পুরো সমাজের উপর এর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। একইভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এই দেউলিয়াপনার ঢেউ আছড়ে পড়ছে। শিক্ষার্থীদের নৈতিক অধপতন ঠেকানোর জন্য কেউ কিছুই করছে না। মুসলিম তরুণ শিক্ষার্থীদের এই অসহায়ত্বের ছবি অর্ধশতাব্দীকাল আগে কবি ইকবালের চোখে ধরা পড়েছিল। তাঁর লেখা একটা কবিতার কয়েকটা চরণ হচ্ছে এই–

আধুনিক যুগ হচ্ছে তোমার মৃত্যুদূত,
রেজেকের ধান্ধায় তুমি আত্মা থেকে বঞ্চিত,
তোমার শিক্ষা তোমাকে উন্নত আবেগ থেকে করেছে বিচ্ছিন্ন,
যে আবেগ মনকে পলায়ন প্রচেষ্টা থেকে রাখত বিরত।
প্রকৃতি তোমাকে দিয়েছিল বাজপাখীর শ্যেনদৃষ্টি,
দাসত্ব তোমার অক্ষি কোঠরদ্বয়ে রেনের (ক্ষুদ্রাকৃতি পাখী) আঁখি ঢুকিয়ে দিচ্ছে
স্কুল তাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছে গূঢ় তত্ত্বগুলো
যা পাহাড়ে আর মরুপ্রান্তরে রয়েছে উন্মুক্ত।


www.pathagar.com

অন্যদিকে ইসলামী শিক্ষার অবস্থাটাও একটু পর্যালোচনা করা যেতে পারে। বাংলাদেশ সহ মুসলিম দেশগুলোর প্রায় সর্বত্রই শিক্ষা পরিকল্পনা ও পাঠ্যসূচীর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো এখন পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করছে ধর্মনিরপেক্ষ পশ্চিমী ধাঁচের শিক্ষায় শিক্ষিত ও মন মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিরা, যারা হলো মেকলের এ দেশীয় যথার্থ প্রতিনিধি। সুতরাং এদের পরিকল্পনায় মাদ্রাসা শিক্ষা বা ইসলামী শিক্ষা অবহেলিত থাকবে এটা খুবই স্বাভাবিক। ধর্মনিরপেক্ষ পরিকল্পনায় এমন ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে যে, মাদ্রাসা থেকে যারা পাশ করে বের হবে তারা যেন স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমানুপাতে সুবিধা না পেতে পারে। এ পরিকল্পনার কারণেই ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মঞ্জুরীকৃত সরকারী তহবিলের পরিমাণ খুব কমই হয়ে থাকে। পাশাপাশি টেকনিক্যাল সাপোর্টও নেই বললেই চলে। এসব কারণে ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলো মানের দিক দিয়ে স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে পিছিয়ে পড়ে। অথচ যথারীতি অভিযোগ করা হয়, মাদ্রাসা শিক্ষা আধুনিক ও যথেষ্ট মানসম্মত নয়। এসবই ঔপনিবেশিক কৌশলপ্রণেতাদের মস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তাভাবনা। ব্যক্তির মত কোন পদ্ধতিও সংশোধনের বাইরে নয়। মাদ্রাসা শিক্ষার দুর্বলতাগুলো খতিয়ে দেখা যেতে পারে কিন্তু বন্ধ করার প্রশ্নই ওঠে না। ইংরেজ আমলে মাদ্রাসা শিক্ষা কখনোই সরকারের সুনজর পায়নি। যদিও ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৮০ সালে কোলকাতা মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন এবং সেটা ছিল বৃটিশ শাসনের সূচনাকাল। নওয়াব আবদুল লতিফের মত সেকালের মুসলমান নেতারা মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বহু চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ইংরেজরা তাদের সাম্রাজ্যিক স্বার্থেই সে চেষ্টা পুরোপুরি সফল হতে দেয়নি। মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের আর একটা বড় রকমের চেষ্টা হয়েছিল এ শতকের গোড়ার দিকে। এর উদ্যোগ নিয়েছিলেন শামসুল ওলামা আবু নসর মোহাম্মদ ওহীদ। তার প্রবর্তিত শিক্ষা পদ্ধতির নাম ছিল নিউ স্কীম মাদ্রাসা। কিন্তু এ পদ্ধতিও বেশি দিন টিকতে পারেনি। তারপরে এ দেশের ইসলামী শিক্ষা অনেক চড়াই-উৎরাই পার হয়ে এসেছে। অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি ইতোমধ্যে সংশোধনের ব্যবস্থা হয়েছে। আধুনিক পেশা ও জীবন-জীবিকার সাথে সামঞ্জস্য রেখে মাদ্রাসা শিক্ষাকে ঢেলে সাজানোর কিছুটা চেষ্টা হয়েছে এবং হচ্ছে। যেটুকু হয়নি, সেটুকু যাতে হতে পারে অচিরেই তার ব্যবস্থা করা উচিত।

এর উপর প্রকৃত অর্থে যেটা করা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে, আমাদের দেশের পুরো শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও ত্রুটিগুলো সংশোধন করা। এর প্রধান ত্রুটি হচ্ছে, মুসলিম শিক্ষার মধ্যে বিরাজিত দ্বিমুখী ধারা। তার মানে ইসলামী ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে ফেলে একটা একক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা যেমন বর্তমানকালের পরিবর্তনশীল জীবন-জীবিকার প্রয়োজন মেটাবে তেমনি এর সাথে ইসলামী নৈতিকতার ধারণাকে সমন্বিত করতে হবে। যে পাশ্চাত্য নৈতিকতা আমাদের একটা ক্ষয়িষ্ণু আদর্শবিহীন জাতিতে পরিণত করতে চলেছে, তাকে এই মুহূর্তে ঠেকানো না গেলে অচিরেই আমরা একটা দো-আঁশলা জাতিতে পরিণত হবো।

কিন্তু এ দায়িত্ব কে নেবে? কার উপর বর্তাবে সে পতাকা বহন করার দায়িত্ব? তাঁদের কাছেই আরজ করছি, যাঁরা দেশের কথা ভাবেন, জাতির কথা ভাবেন, ধর্মের কথা ভাবেন। তাদের কাছে নয়, যারা মেকলে বর্ণিত ভারবাহী পশুর জীবন যাপন করছেন।


www.pathagar.com

# ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ঃ কিছু স্মৃতি কিছু অনুভূতি

১.

আদর্শের কি কখনো পরাজয় ঘটে? মৃত্যু মানুষের আপাত স্থায়ী জীবনের অবসান ঘটায় ঠিক; কিন্তু আদর্শ হলো এক প্রবহমান সত্য যা কালের মতই অখণ্ড, জরা ও মৃত্যু যার শরীরে আঁচড় কাটতে পারে না।

ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন এমনি এক আদর্শের প্রতিভূ। আমরা যে সমাজে বাস করি তার চারিদিকে অচলায়তনের বেড়া তোলা। প্রতিনিয়ত প্রতিকূলতার মুখে অবনত হই; অন্ধকারে আপোশ কামিতার হাত বাড়িয়ে কদর্যতার জোয়ারে ডুব দেই। সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন সম্পর্কে এর একটিও সত্য নয়। নিরাপোশ, স্থিতধী, অচঞ্চল এক আদর্শের অগ্নিপুরুষ তিনি। মৃত্যু তার লৌকিক জীবনের ছেদ টেনে দিয়েছে সত্য, কিন্তু তার চেয়েও বড় সত্য মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর আদর্শের জয়গান গেয়েছেন।

বাঙ্গালী মুসলমানের জীবনে বর্তমান শতাব্দী হচ্ছে এক রূপান্তরকালীন সময়। কত পরিবর্তনের স্রোত, কত ভাঙ্গাগড়ার শব্দ যে এ সময় বাঙ্গালী মুসলমানের জীবনে আছড়ে পড়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন, আজাদীর সংগ্রাম, মুসলিম হোমল্যান্ড প্রতিষ্ঠা আবার সেই স্বপ্নের হোমল্যান্ডের বুকে ছুরি চালিয়ে দ্বিখণ্ডিত করা এসব আমরা বর্তমান শতাব্দীতেই দেখেছি। এ দীর্ঘ সময়ে কত মানুষ বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, ভেঙ্গে আবার নিজেকে গড়েছে, নতুন সময়ের চাহিদা অনুযায়ী নিজেদেরকে মানিয়েও নিয়েছে। কিন্তু ডঃ সাজ্জাদ হোসায়েন তার ব্যতিক্রম। সময়ের বলিরেখা হয়ত তার অবয়বিক শরীরে পরিবর্তন এনেছিল কিন্তু তার আদর্শের মাস্তুলে আঘাত হানতে পারেনি। ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন শিক্ষাব্রতী ছিলেন, বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যে প্রথম ইংরেজীতে পি, এইচ, ডি অর্জনকারী ছিলেন। এ রকম অসংখ্যগুণের কথা তার সম্পর্কে বলা যায়। কিন্তু সে পরিচয় আজ তার গৌণ। জাতি হিসেবে আমাদের আত্মপরিচয়ের কথা যখন উঠবে, বাঙ্গালী মুসলমানের শিকড়ে ফেরার তাগিদ যখন অনুভূত হবে ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের কথা তখন আরো বেশি করে আমাদের কানে বাজবে। নিজের ইতিহাসকে ভালবেসে, নিজের স্বকীয়তাকে উচুঁতে তুলে ধরে তাঁর এতটুকু গ্লানিবোধ হয়নি। আমরা এমন একটা সমাজে বাস করছি যেখানে গুণীর কদর নেই। বর্তমান শতকে বিশেষ করে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরে আমাদের সমাজ কাঠামোতে এত দ্রুত ধ্বস নেমেছে যে আমাদের অর্থ ও প্রতিপত্তি লিপ্সার বেগবান স্রোতের তলায় মূল্যবোধের মায়াবী জগত হঠাৎ চাপা পড়ে গেছে। সবকিছুতেই ভর করেছে নিরাবেগ কৃত্রিমতা।

ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ছিলেন এই উজান স্রোতে একলা চলার মাঝি। আলো হাতে আঁধারের যাত্রী।

২.

ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের একটি রাজনৈতিক-আদর্শিক পরিচয় আমাদের কাছে উঠে এসেছিল। যদিও তিনি রাজনীতিবিদ ছিলেন না। একজন জাত শিক্ষাবিদ ও জ্ঞান সাধক



www.pathagar.com

বলতে যা বুঝায় ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ছিলেন প্রকৃত অর্থে তাই। বড় মানুষের জীবনে কিছু কিছু ট্র্যাজেডীর বৃত্ত রচিত হয়। না চাইলেও সেই বৃত্ত ভেঙ্গে বেরিয়ে আসা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন রাজনীতির ঘেরাটোপে আটকা পড়েছিলেন যা তিনি কখনোই প্রত্যাশা করেননি। জ্ঞান সাধকরা হচ্ছেন আলোকিত প্রদীপের মত। আলো বিতরণ করাই হচ্ছে তাদের কাজ। ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনও কি তা করেননি? কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের কূপমন্ডুকতা, আমাদের দেশের রাজনৈতিক কদর্যতা মুঠি ভরে তাঁর বিতরিত জ্ঞান আহরণে বারবার বাধাগ্রস্ত করেছে।

ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ছিলেন ত্রিকালদর্শী। তাঁর জন্ম হয়েছিল ঔপনিবেশিক বৃটিশ ভারতে। যৌবনের রুদ্র তামাটে সময়টাও মূলত তাঁর কেটেছিল ঔপনিবেশিক আমলে। যদিও এ সময় বাঙ্গালী মুসলমানের আজাদী আন্দোলন তীব্রতর হয়ে উঠেছে, আত্মপরিচয়হীন বিপর্যস্ত বাঙ্গালী মুসলমান সমাজ ইঙ্গ-হিন্দু যৌথ ষড়যন্ত্রের কবল থেকে বাঁচবার জন্য স্বকীয়তার বাণীতে কেবলমাত্র আত্মস্থ হয়ে উঠতে শুরু করেছে। এমনি এক পরিবেশে তিনি বড় হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ঢাকা ইউনিভার্সিটির সোনালী যুগের ইংরেজীর ছাত্র। যেসব গুণী শিক্ষক ও ছাত্রের কল্যাণে এক সময় ঢাকা ইউনিভার্সিটিকে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলা হত বোধ হয় তিনি তার উজ্জ্বলতম প্রতিনিধি। পাকিস্তান আন্দোলনের রাজনৈতিক জোয়ারে তিনি কখনো নিজেকে যুক্ত করেননি। কিন্তু এর সাংস্কৃতিক ও তমদ্দুনিক ফ্রন্টের তিনি ছিলেন প্রথম কাতারের যোদ্ধা।

সেই ছাত্র জীবনেই ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে তাঁর অধিনায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ। ১৯৪২ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংসদের তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। সংসদের উদ্যোগে ১৯৪৩ সালে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে এক সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যা বাঙ্গালী মুসলমান তরুণ সাহিত্য ব্রতীদের মধ্যে সেদিন বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। উল্লেখ্য এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত সাংবাদিক আজাদ সম্পাদক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন। এই সম্মেলনে ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন প্রত্যয়ের সাথে ঘোষণা করেনঃ বাঙ্গালী মুসলমান সাহিত্যব্রতীদের রয়েছে এক স্বতন্ত্র ঐতিহ্য, যা সুনির্দিষ্টভাবে হিন্দু ঐতিহ্য থেকে পৃথক। তিনি এ প্রসঙ্গে ১৮৯০ সালে সূচিত সাহিত্য আন্দোলন Irish Twilight এর সাথে সংশ্লিষ্ট সাহিত্যব্রতীদের কথা উল্লেখ করেন, যারা একই ভাষায় লেখালেখি করেও আয়ারল্যান্ডের মাটি থেকে আহরিত মিথ, লিজেন্ড, উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও ঐতিহ্যের ব্যাপক ব্যবহার করেছেন যা তাদের সাহিত্যকে ইংল্যান্ডের সাহিত্য থেকে স্বতন্ত্র স্বকীয়তা দিয়েছে।

ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন জীবদ্দশায় এই একটা কথা বারবার উল্লেখ করেছেন, বাঙ্গালী মুসলমানের জাগরণ ও মুক্তি তখনই সম্ভব যখন সে তার স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক স্বকীয়তাকে মর্যাদার সাথে প্রতিষ্ঠিত করবে। এই একটি মাত্র কারণ- সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য- যার জন্য বাংলাদেশ ১৯৪৭ সালে ভারতভূক্ত হয়নি। এমন যদি হতো বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী ইসলাম ধর্মালম্বী না হয়ে অন্য কিছুর অনুসারী হতো তবে আর যাই হোক ১৯৪৭ সালে এই ভূখণ্ড নিশ্চিত করে বলা যায় ভারতীয় মানচিত্রের অন্তর্ভূক্ত হতো। এই সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও ঐতিহ্যের কথা মরহুম আবুল মনসুর আহমদও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর খামার বাংলা ও টাওয়ার বাংলার কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।


www.pathagar.com

আজ বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে বোঝা যাবে না কি গভীর আকুতি, বিশ্বাস ও কমিটমেন্ট নিয়ে ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনকে সেদিন কাজে নামতে হয়েছিল।

আজকের তরুণ প্রজন্ম জানে না সেদিন কেন পূর্ব বাংলার মানুষ পাকিস্তান আন্দোলনে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছিল? কেন তারা হিন্দুদের থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে স্বতন্ত্র আবাসভূমি ও স্বকীয়তার উজ্জীবন কামনা করেছিল? তিনি তাঁর সাড়া জাগানো গ্রন্থ একাত্তরের স্মৃতিতে এর পটভূমি বিশ্লেষণ করেছেন। ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন আমৃত্যু এই স্বকীয়তার জয়গান গেয়েছেন। জাতি হিসেবে এখন আমাদের আইডেন্টিটি ক্রাইসিস চলছে। এই সংকট উত্তরণের একমাত্র উপায় হচ্ছে আমাদেরকে স্বকীয়তার বাণীতে আত্মস্থ হওয়া। ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন মনে করতেন এই স্বকীয়তার মৌল উপাদান হচ্ছে ইসলাম। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন ইংরেজী ভাষার পণ্ডিত। তিনি যেমন চোস্ত ইংরেজী জানতেন তেমনি চোস্ত ইংরেজীতে লেখালেখিও করতেন। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে ব্যাপকভাবে সফরের অভিজ্ঞতাও তাঁর ছিল। এতদসত্ত্বেও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি তাকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করতে পারেনি। ইসলামী মূল্যবোধ ও জীবন ভাবনাকেই তিনি আমৃত্যু আঁকড়ে ধরেছিলেন। পাকিস্তান উত্তরকালে আমরা তাঁকে দেখেছি একজন পণ্ডিত, জ্ঞান তাপসের ভূমিকায়। জাতির মনন চর্চায় এবং ইংরেজী ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি যে সুবিশাল অবদান রেখে গেছেন তা ভুলবার নয়। এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এবং আজকের বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠানিকভাবে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অগ্রদূত। জ্ঞান তাপস ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন এ কথা জোর দিয়ে বলেছেন জাতি হিসেবে এগিয়ে যাওয়ার জন্য, পাশ্চাত্যের টেকনোলজীকে আহরণ করবার জন্য আমাদের ইংরেজী ভাষার সহযোগিতা প্রয়োজন। ভাষা আন্দোলনের আবেগ ও মরীচিকায় আমরা ইংরেজী ভাষাকে বর্জন করতে চেয়েছিলাম, যার ফল আজ বেদনাদায়কভাবে প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। শুধু তাই নয়, আমাদের তরুণ প্রজন্ম মাতৃভাষাকেও আজ ভালভাবে আয়ত্ত করতে পারেনি। এই অশুভ পরিণতি সম্পর্কে ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন বহুপূর্বেই হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছিলেন। কিন্তু আমাদের দেশের একশ্রেণীর অদূরদর্শী রাজনীতিবিদ সেদিন ভাষার রাজনীতি করেছেন। বাংলা ভাষাকে ব্যবহার করে নিজেদের আখের গুছিয়েছেন; কিন্তু জাতির ভবিষ্যৎ মনন চর্চার দিকে তারা খেয়াল রাখেননি ১৯৭১ সালে ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ছিলেন ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভাইস চান্সেলর। বাঙ্গালী মুসলমানের জীবনে তখন চলছিল এক ঐতিহাসিক রূপান্তর প্রক্রিয়া। সশস্ত্র বিদ্রোহ, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, আগ্রাসী ভারতের ষড়যন্ত্র তখন পূর্ব বাংলার মুসলমানদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছিল। অগণ্য বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ সমাজকর্মীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যারা ৪৭ সালে পাকিস্তান আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন কিংবা এর রাজনৈতিক ও আদর্শিক প্রেরণায় উজ্জীবিত বোধ করেছিলেন, তারা ৭১-এ এসে রাতারাতি ভোল পাল্টিয়ে ফেলেছেন অথবা ভারতীয় ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা দিয়েছেন। অথচ এরাই আবার পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ফলে অর্জিত সুযোগ সুবিধার সর্বাত্মক সদ্ব্যবহারও করেছেন।

১৯৭১ সালে ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন এক ঐতিহাসিক ও কালজয়ী ভূমিকা পালন করেছেন। অনাগত কালের ভবিষ্যৎ তার যথাযথ মূল্যায়ন করবে। ভোল পাল্টানোর চরিত্র



www.pathagar.com

তার ছিল না। যৌবনে যে স্বকীয় আদর্শের প্রত্যয় তিনি ব্যক্ত করেছিলেন, যে কালচারাল অটনমীর তিনি প্রবক্তা ছিলেন, ইসলামের যে নিরাপোশ আদর্শ ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন তারই প্রেক্ষিতে তিনি ৭১ সালে ভারতীয় ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে জাতিকে হুশিয়ার করে দিয়েছিলেন। সময় প্রমাণ করেছে আজ বাংলাদেশ মূলত একটি ভারতীয় সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক চারণভূমিতে পরিণত হয়েছে। সময় আরো প্রমাণ করেছে কারা সেদিন সোনার বাংলা শ্মশান কেন বলে জিগির তুলেছিল, দুআনা চাল তিন আনা ডাল খাওয়ানোর প্রতিশ্রুতির অন্তরালে ভারতীয় শিখণ্ডী ও বরকন্দাজ হিসেবে কাজ করেছিল। সময় এ কথাও প্রমাণ করেছে এই গোষ্ঠী পূর্ব বাংলার মুসলমানদের তরক্কী আদৌ কখনো চায়নি। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর এই জ্ঞান তাপস পণ্ডিতের উপর নেমে এসেছিল হিটলারী কায়দায় নির্যাতন। আজকে বাংলাদেশের বিপর্যস্ত মূল্যবোধের কথা উল্লেখ করে অনেকেই শঙ্কিত ও কম্পমান হয়ে ওঠে। কিন্তু ৭১ সালে এমনি একজন শিক্ষাগুরুকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের নাম করে একটি চিহ্নিত গোষ্ঠী সেদিন তাদের হাত পাকিয়েছিল। সেই শুরু। আজ দেখছি শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মিনি ক্যান্টনমেন্ট, সর্বত্র নৈরাজ্য আর হাহাকার।

ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না। অনাগত ভবিষ্যতের কাঠগড়ায় মুক্তিযুদ্ধের নামধারী এই চিহ্নিত গোষ্ঠীকে একদিন দাঁড়াতেই হবে।

৩.

সাজ্জাদ স্যারের সাথে আমার কিছু ব্যক্তিগত স্মৃতি আছে। তিনি আমার শিক্ষক নন কিন্তু শিক্ষক তুল্য। আমি তার কথা প্রথম শুনতে পাই আমার মরহুম আব্বাজানের কাছ থেকে। স্যারের সাথে তার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। আব্বাকে আমাদের ভাইবোনদের সামনে বহুবার সাজ্জাদ স্যারের কথা বলতে শুনেছি। স্যারের কথা বলতেই আব্বা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন। স্যারের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও জাতির মনন চর্চার ক্ষেত্রে তার অবদানের কথা আব্বা বারবার আমাদের সামনে উল্লেখ করতেন। তখন থেকেই আমার সাজ্জাদ স্যারের প্রতি এক ধরনের উৎসুক্য জন্মেছিল। সেই উৎসুক্যই হয়ত কোন অবচেতন মুহূর্তে আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল তার কাছে। আমি তখন মেডিকেল কলেজে ফিফথ ইয়ারে পড়ি। ঠিকানা সংগ্রহ করে একদিন সত্যি সত্যি নাজিমুদ্দীন রোডস্থ স্যারের বাসা জোহরা মঞ্জিলে যেয়ে হাজির হলাম। আব্বার কথা বলতে তিনি সাদরে আমাকে কাছে টেনে নিয়ে বসালেন। স্যারের একটা বড় গুণ দেখেছি নতুন কেউ তার কাছে আসলেই সবার আগে তার নামটা জিজ্ঞাসা করতেন। তার কাছে এই নামের গুরুত্বটা প্রচণ্ডভাবে অনুভূত হতো। কেননা একটা নাম শুধু নাম নয়, এটা একটা সংস্কৃতির প্রতীকও বটে। স্যারকে বারবার বলতে শুনেছি একটা শব্দের সাথে, একটা নামের সাথে একটা সংস্কৃতির স্পন্দন শোনা যায়। হাল আমলে কিছু মুসলমান ছেলে মেয়ে প্রগতিশীলতা ও অনুকরণ প্রিয়তার আতিশয্যে নিজেদের নামকে তথাকথিত বাঙ্গালীকরণ (হিন্দুকরণও কি বলা যায়?) করতে শুরু করেছে। যেমন বৃষ্টি রহমান, কবিতা ইসলাম ইত্যাদি। সাজ্জাদ স্যার বলতেন এ হচ্ছে এক ধরনের হীনমন্যতা। নিজের সংস্কৃতিকে যদি ভাল করে না জানা যায় অথবা নিজের সংস্কৃতি সম্বন্ধে যদি কোন


www.pathagar.com

কারণে উঁচু ধারণা না জন্মায় তবে এ ধরনের বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। তিনি আরো বলতেন আজ গড্ডালিকা প্রবাহে নিজেদের ভাসিয়ে দিয়ে এ দেশের মুসলমান ছেলে মেয়েরা যা করছে, ওপার বাংলার বাঙ্গালী হিন্দুদের বাঙ্গালীত্বের খাতিরে, সমন্বয়বাদের খাতিরে একইভাবে যদি মুসলমানের নামের সাথে মিশিয়ে কোন নাম রাখতে বলা হয় তবে ওরা কি সে কথা শুনবে। সেই প্রথম দিন স্যার আমার নামটা শুনলেন এবং মন্তব্য করলেন এটা হচ্ছে আরবী ও ফারসী দুটো শব্দের মিশ্রণ যার অর্থটা বেশ ব্যঞ্জনাময়।

সাজ্জাদ স্যারের সাথে আমার দ্বিতীয় সাক্ষাতকারটা ঘটে আমার নিজের লেখা একটা প্রবন্ধ নিয়ে। আমি এ সময় আল্লামা ইকবালকে নিয়ে কিছু লেখালেখি করেছিলাম এবং আমার আলোচ্য প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল ইকবাল ও এলিয়ট ঃ একটি তুলনামূলক বিবেচনা। লেখাটা স্যারকে দেখিয়ে নিয়েছিলাম, কেন না ইংরেজী ভাষার পণ্ডিত হিসেবে এলিয়ট সম্পর্কে তার মতামত আমার জন্য অনেকটা শিরোধার্য মনে হয়েছিল। তাছাড়া ইকবালের উপরও তার প্রচুর পড়াশোনা ছিল। পরবর্তীকালে লেখাটা যখন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তখন স্যার আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছিলেন তুমিত লেখক হয়ে গিয়েছ। লেখাটা আসলেই সুন্দর হয়েছে।

আমি জানতাম লেখক হিসেবে আমার আদৌ কোন গুরুত্ব নেই কিন্তু তবুও সেদিন আমাকে নিয়ে স্যারের উচ্ছাস আমার মত ক্ষুদে লেখকের অন্তরেও প্রেরণার মশাল জ্বেলে দিয়েছিল। পরবর্তীকালে ইকবালের উপর আমার রচিত গ্রন্থ 'ইকবাল মননে অন্বেষণের' ভূমিকা সাজ্জাদ স্যার লিখে দিয়েছিলেন। শুধুমাত্র কৃতজ্ঞতার ভাষা দিয়ে সে অনুভূতি আজ প্রকাশ করতে পারবো না।

একদিনের ঘটনা বলছি। স্যারের Fundamentalism নামে একটি ইংরেজী প্রবন্ধের ডিকটেশন নিচ্ছিলাম। ঐ প্রথম আমি তার চোস্ত ইংরেজী উচ্চারণে বিশুদ্ধ ইংরেজী লেখার সাথে পরিচিত হলাম। এ ছিল আমার এক অভাবনীয় অভিজ্ঞতা। এত বিশুদ্ধ ইংরেজী উচ্চারণ শৈলী এর আগে আমি কখনো কারো মুখ থেকে শুনতে পাইনি। পরবর্তী সময়ে অবশ্য আমি তার কাছ থেকে নানা বৈচিত্রময় ইংরেজী উচ্চারণ শিখেছি, নতুন নতুন Idioms এর কথা জানতে পেরেছি যা তার কাছ থেকে আমার এক বড় পাওয়াই বলতে হবে।

ইংরেজী চর্চার কথা বলতে যেয়ে সাজ্জাদ স্যার দুজন মানুষের কথা বিশেষভাবে বলতেন। একজন জাস্টিস সৈয়দ আমীর আলী আর একজন প্রফেসর খোদা বক্স। বিশেষ করে সৈয়দ আমীর আলীর The Spirit of Islam কে তিনি খুব উঁচুদরের পুস্তক মনে করতেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি একদিন আমাকে বলেছিলেন তরুণ শিক্ষিত মুসলমানের অন্তরে সেকালে জাতীয় জাগরণ ও স্বকীয়তার বাণীকে মূর্ত করে তুলেছিল এই একটি মাত্র অসাধারণ গ্রন্থ। এর সাথে তিনি মাঝে মাঝে আল্লামা ইউসুফ আলীর কোরআন শরীফের তরজমার কথাও বলতেন। কেননা সেকালে শিক্ষিত তরুণদের অন্তরে এই তরজমাখানিও বেশ সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়েছিল।

স্যারের আর একটা বৈশিষ্ট্যের দিক উল্লেখ করছি। প্রত্যেকের যোগ্যতাকে তিনি কুণ্ঠহীনভাবে স্বীকৃতি দিতেন। সে যদি ভিন্নমতালম্বী হতো তবুও। তার মধ্যে আমি কখনো


www.pathagar.com

কূপমণ্ডুকতার প্রশ্রয় দেখিনি। একদিন বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে বলেছিলেন সাম্প্রদায়িক হলেও তিনি একজন বড় মাপের ঔপন্যাসিক। একজন লেখকের যে কিছু সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকে বঙ্কিমচন্দ্র তা নিপুণতার সাথে পূরণ করেছেন। আশ্চর্য হওয়ার মতো ঘটনা তার উপন্যাস কিভাবে একটা জাতিকে জাগিয়ে দিয়েছিল, বিশেষ করে তার সাম্প্রদায়িক 'বন্দে মাতরম' শ্লোগান ভারতীয় হিন্দুদের জাগরণে এক অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছিল।

নেহরুর কথা বলতেন বিশেষ করে তার পাণ্ডিত্যের উচ্ছসিত প্রশংসা করতেন। তার Discovery of India বইটিকে স্যার মনে করতেন আগ্রাসী ব্রাহ্মণ্যবাদের মানসিক বহিঃপ্রকাশ হিসেবে। নেহরুর কথা বলতে যেয়ে স্যারের একটা আক্ষেপ বেরিয় আসত। বলতেনঃ হিন্দু রাজনীতিবিদরা রাজনীতির পাশাপাশি লেখাপড়াও করে আর মুসলমান রাজনীতিবিদরা শুধু রাজনীতিই করে। তাই তাদের কাছ থেকে আমরা Glimpses of world History বা ঐ জাতীয় গ্রন্থ আজও খুঁজে পাইনি।

মওলানা আজাদকে তিনি মনে করতেন একজন বড় মাপের ইসলামিক স্কলার। যদিও কংগ্রেসের হিন্দু রাজনীতিবিদদের বরকন্দাজ ও শিখণ্ডী হিসেবে কাজ করতে যেয়ে তিনি মুসলিম স্বার্থের সাথে গাদ্দারী করেছিলেন। স্যার একদিন আমাকে একটা ইন্টারেস্টিং ঘটনা বললেন। ব্যক্তিগত জীবনে নেহরুর মদ ও নারী কোনটিতেই অরুচি ছিল না। মওলানা আজাদও নাকি নেহরুর সাহচর্যে এসে প্রথমটি ভালো করেই আয়ত্ত করেছিলেন।

আমি একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম কায়েদে আযম জিন্নাহর চরিত্রের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও বিশিষ্ট দিক কোনটি। স্যার বললেন তার নিরাপোশ ও অনমনীয় বিশ্বাসের দৃঢ়তা। শুধু এই একটি মাত্র গুণের কারণেই ইঙ্গ-হিন্দু যৌথ ষড়যন্ত্রের কবল থেকে পাকিস্তান ছিনিয়ে এনেছিলেন। ইতিহাস তার যথার্থ সাক্ষী।

আজ স্যারের কথা কত বিভিন্নভাবেই না মনে পড়ছে। কত টুকরো স্মৃতি আজ মনের আকাশে ভিড় জমিয়ে চলেছে। সেসব কথা লিখতে গেলে শেষ হবে না। একদিন তার পাশ্চাত্য দেশগুলোর সফরের অভিজ্ঞতা থেকে বলছিলেনঃ ১৪০০ বছর আগে জন্ম গ্রহণ করেও বিশ্বাস আর কর্মের দিক দিয়ে রসূল (স) যে কতখানি Modern ছিলেন তা আধুনিক সভ্যতাগর্বী পাশ্চাত্যের লোকেরা চিন্তাও করতে পারবে না। জিজ্ঞাসা করলাম কেন?

বললেন এত উন্নত সভ্যতার দাবীদার হয়েও ওরা আজও ব্যক্তিগত জীবনে পরিচ্ছন্নতার দীক্ষা পায়নি। উপরে ঝকঝকে পোশাক পরিচ্ছদ তার উপরে নিপুণভাবে সুগন্ধি স্প্রের ব্যবহার কিন্তু কাছে যেয়ে দেখবে শরীর থেকে ভগভগ করে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। কারণ ওরা কখনও নিয়মিত গোসল করে না। অথচ আমাদের এই হতোদ্যম গরীব মুসলিম দেশের জনগণ যারা ঠিকমত দুবেলা পেটপুরে খেতেও পারে না তাদের শরীর থেকে এ রকম দুর্গন্ধ আদৌ আশা করা যাবে না। সেই যে ১৪০০ বছর আগে রসূল (স) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকে ঈমানের অঙ্গ বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন এতো সেই শিক্ষারই ফল।

স্যার নিজের ব্যক্তিগত একটি স্মৃতিচারণ করতেনঃ ছোট বেলায় আমি হাই মাদ্রাসায় পড়েছিলাম। এটা আমার খুব কাজে লেগেছিল। কারণ ইসলামের হুকুম, আহকাম, উসুল, ফারায়েজের প্রাথমিক ধারণা আমি যা ওখান থেকেই পেয়েছিলাম। তাই পরবর্তীকালে আমার দিকভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল নিতান্ত কম। আজ দেশের তরুণ প্রজন্ম ইসলামের


www.pathagar.com

এই প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। তারা 'O' লেভেল, 'A' লেভেল, ইংরেজী গ্রামার স্কুল অনেক কিছু থেকেই শিক্ষা পেয়ে থাকে কিন্তু ইসলামের এই প্রাথমিক শিক্ষা যা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের জন্য কত জরুরী তা থেকে তারা দূরে থাকে যার পরিণতিতে তাদের বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাটাই পরবর্তীকালে প্রকট হয়ে দেখা দেয়। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার এই মারাত্মক ত্রুটি আজও বহাল তবিয়তে আছে।

স্যারের নাজিমুদ্দীন রোডস্থ বাড়িতে দেখেছি সব সময় কোন না কোন লোকের উপস্থিতি; বুদ্ধিজীবি, শিক্ষক, ছাত্র, রাজনীতিবিদ আর জ্ঞান পিপাসুদের ভীড়, স্যার অনর্গল কথা বলে চলেছেন আর তারা শুনছেন। সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, সভ্যতা, রাজনীতি, ধর্ম, দর্শন কোন বিষয় না তিনি জানতেন। কখনো কখনো আমার মনে হতো স্যার একটা বটবৃক্ষ যার ছায়ার নীচে অগণ্য পিপাসার্ত পথিক আশ্রয় নিয়েছে। কখনো কখনো মনে হয়েছে স্যার হচ্ছেন এক জ্ঞানের দরিয়া বাহরুল উলুম। একদিনের কথা মনে পড়ছে। স্যারের বাসায় একটা ছোট্ট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। আমরা বিশজনের মত উপস্থিত ছিলাম। অধিকাংশই তরুণ বয়সী। স্যার আমাদের উদ্দেশ্যে একটা ছোট্ট বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য। সেদিন আমার মনে হয়েছিল স্যারের বক্তৃতায় আমার নতুন করে চোখ খুললো। অনেক কথার মধ্যে তিনি এ কথাও বলেছিলেন ভারতীয় ইতিহাস থেকে ইসলামের কালজয়ী অবদানকে মুছে দেয়া আদৌ সম্ভবপর নয় এবং সে চেষ্টা যদি হয় এমনকি মৌলবাদী হিন্দুদের চাপেও হয় তবে হয়ত ভারত রামরাজত্বে ফিরে যেতে পারবে কিন্তু সভ্য ভারত হিসেবে পরিচয় দেবার তার তেমন কিছুই থাকবে না। আধুনিক সভ্যতার যে সব মৌল অবদান তার অনেকাংশই ইসলাম অনুসারীরা ভারতবর্ষে নিয়ে এসেছিল।

এদেশে ইসলাম আসার আগে ভারতীয়রা সেলাই করা কাপড়ের ব্যবহার জানত না; পাকপ্রণালী ও রন্ধন কৌশল যে একটা উঁচুদরের Art তা কেবল মুসলমানরা এসেই শিখিয়েছিল। ভারতীয় কলা ও ফাইন আর্টসের ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদানতো অনস্বীকার্য। তাদের অবদান ছাড়া ভারতীয় মিউজিকের কথা চিন্তাই করা যায় না। স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও সেই একই অবস্থা। আদি ভারতীয়দের গর্ব করার মধ্যে ছিল এক অজন্তা ইলোরা ও কোপারকের মন্দির গাত্রে কিছু অশ্লীল যৌন ক্রীড়ার খোদিত দৃশ্য। সে আর যাই হোক কখনো শিল্পকলার মডেল হতে পারে না। যদিও প্রচার প্রোপাগান্ডার অন্তরালে এই পচা রদ্দিমালই আজ ব্রাহ্মণ্যবাদীরা শিল্পের অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসেবে চালিয়ে দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে চলেছে। এ ছাড়া মোঘল রাজদরবারে রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতির যে ধারণা উপ্ত হয়েছিল, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য সংস্কৃতির যে বিকাশ ঘটেছিল তা এক কথায় তুলনা রহিত। হিন্দ, হিন্দুস্তান তার থেকে India নামটি পর্যন্ত আরবদের দেয়া। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে স্যারের মেহমানদারীর কথাও বহুদিন ধরে মনে থাকবে। নাজিমুদ্দীন রোডের সেই কলরব আজ থেমে গেছে। স্যার আজ চিরদিনের দেশের বাসিন্দা, যে দেশ থেকে আর কেউ কোনদিন ফিরে আসে না। যে দেশের বাসিন্দা আজ আমার আব্বাও।

আল্লাহ তাদের দুজনকেই জান্নাতবাসী করুন।



www.pathagar.com

যে কালে আমরা বাস করছি সেকালে মেধা বড় বেশি করে বিষয়বুদ্ধি আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। মেধা আজকাল মন, মনন ও মনীষার প্রকর্ষণার কাজে ব্যবহৃত না হয়ে স্থূল বিলাসের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। অথচ এক সময় ছিল যখন মেধার সাথে যুক্ত হতো আদর্শবাদ এবং এই দুই এর সম্মিলনে ব্যক্তির চরিত্র হয়ে উঠতো বিশিষ্ট। আমাদের এ কালের বিচারে ডঃ হাসান জামান অবশ্যই ব্যতিক্রম ছিলেন, কেন না বিষয়বুদ্ধি ভারাক্রান্ত না হয়ে তাঁর জীবনে আদর্শবাদের প্রাবল্য তাজা ও রঙিন হয়ে উঠেছিল। তার অপার জীবন সাধনা ও প্রাণবন্ত কর্মযোগের দিকে দৃকপাত করলে এ জিনিসটা স্পষ্টতর হয়ে উঠবে এবং এর মধ্য থেকে ফুটে উঠবে এক দেশপ্রেমী, ধর্মপ্রেমী ও মানবপ্রেমীর ঝলমলে ছবি।

আমাদের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে আদর্শবাদের গুরুত্ব যে অনেকখানি ক্ষয়িষ্ণু হয়ে এসেছে তা একেবারে অস্বীকার করা চলে না। অন্যপক্ষে এর যে প্রয়োজনীয়তা আছে, জীর্ণ নৈতিকতা ও মূল্যবোধের যুগে হতবিহ্বল মানবতার জন্য এর প্রয়োজন যে একেবারেই ফুরিয়ে যায়নি এ কথাও আমরা স্বীকার না করে পরি না। এই স্বীকৃতিটুকু যতদিন থাকছে অন্তত জোর দিয়ে বলা যায় ডঃ হাসান জামানের মত মানুষের প্রয়োজন ততদিনে ফুরিয়ে যাচ্ছে না।

ওয়াল্ট হুইটম্যানের একটা উক্তি এরকমঃ What written thou there is only one subject-subject of war কি লিখছ! লেখার বিষয় তো মাত্র একটি– তার নাম সংগ্রাম।

ডঃ হাসান জামানের মত কর্মযোগীর কথা ভাবলে এ উক্তিটা আরো বেশি করে সত্য মনে হয়। জীবনের উষালগ্নেই ইসলামী আদর্শকে তিনি তার জীবনের মিশন হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং নিজের পান্ডিত্য, মেধা ও মনীষার ব্যাপক ব্যবহার ও প্রয়োগ কুশলতার মাধ্যমে এর চূড়ান্ত বিজয়কে এগিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। ডঃ হাসান ছিলেন বড় রকমের যোদ্ধা এবং তার এ যুদ্ধ ছিল মূলত সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের যুদ্ধ। আমরা এখন যে সময়ে বাস করছি তাকে এককভাবে বলা যায় সাংস্কৃতিক পরাধীনতার যুগ। সাম্রাজ্যবাদের অধিকার আমাদের দেশ থেকে অপসৃত হয়েছে এ কথাটা যেমন ঠিক, তেমনি আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছি এটাও ঠিক। কিন্তু সাংস্কৃতিকভাবে, চিন্তা, বুদ্ধিবৃত্তি ও মানসভাবনার দিক দিয়ে আমরা কি পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবমুক্ত হতে পেরেছি? সাম্রাজ্যবাদের ফেলে যাওয়া যে জড়বাদী ও সেকিউলার চিন্তাভাবনা আমাদের মন-মানসিকতাকে আচ্ছন্ন করে আছে তা কি আমাদের স্বাধীন চিন্তা ও মানসিকতার বিকাশকে উৎসাহিত করে?

ডঃ হাসান জামান মনে করতেন আমরা যদি মানসভাবনার দিক দিয়ে অন্যের প্রভাবমুক্ত না হতে পারি, মুসলমান যদি সাংস্কৃতিকভাবে মুসলমানিত্ব অর্জন না করতে পারে তাহলে সেটাকে পুরোপুরি স্বাধীনতা বলা যায় না।



www.pathagar.com

সংস্কৃতি বা তমদ্দুন কথাটার উপর এখানে জোর দিতে চাই। মুসলিম বা ইসলামী তমদ্দুন বলতে হাসান জামান বর্তমানকালে মুসলিম সমাজে আচরিত কতকগুলো ব্যবহার, ব্যবস্থা কিংবা বিধানাবলীর দিকে ইংগিত করেননি। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে ইসলামের প্রভাব অনস্বীকার্য। কিন্তু সে প্রভাব ইসলামের পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়, ইসলামী আদর্শের পূর্ণ প্রতিফলন সেখানে নেই। হাসান জামান মনে করেন ইসলামী তমদ্দুন হতে হবে ইসলামী আদর্শের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এ কালে মুসলমানদের জীবনে অসংগতি আর অসংলগ্নতা এত ব্যাপকভাবে বিস্তারিত হয়েছে যে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া বড় বেশি রকমভাবে কঠিন হয়ে পড়েছে। সবচেয়ে বড় সমস্যাটা হচ্ছে আমাদের পরিবেশ আর দৃষ্টিভঙ্গীর। যে পরিবেশে আমরা বাস করছি তাকেই আমরা মনে করছি চূড়ান্ত। অন্যদিকে যে দৃষ্টিভঙ্গি আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে তাকেই আমরা অপরিবর্তনীয় হিসেবে গ্রহণ করে ফেলেছি। ফলে আমরা এদিক থেকে শিরকের মধ্যে পড়ে গেছি। আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করছি অথচ তার দেয়া মূল্যবোধ আমরা গ্রহণ করছি না। আমরা পরিবেশের পূজা করছি। বিশ্বাস আর প্রয়োগের মধ্যে এই অসংগতি আমাদেরকে মুশরিক বানিয়ে দিচ্ছে।

আর একটা জিনিস হলো আমাদের সমাজে ইসলাম সম্পর্কে যে প্রচলিত ধ্যান-ধারণা আছে সেই দৃষ্টিভঙ্গীটাকেই আমরা মনে করছি ইসলাম, অথচ এই ইসলামকে আমরা কখনো কোরআনের সাথে, রসূলের জীবনের সাথে মিলিয়ে দেখিনি। ফলে আমাদের জীবনে ইসলাম তাৎপর্যহীন হয়ে উঠেছে। এই তাৎপর্যহীনতা, জীবন সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে ইসলামের ভয়ানক রকম অনুপস্থিতি মুসলমানদের অবনতিকে দ্রুত গতি দিয়েছে, ডঃ হাসান জামান তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন।

এই বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবী আমাদের আর একটা বিভ্রান্তির দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। এ কালে অনেক মুসলমান বিশ্বাস করতে শিখেছেন জ্ঞান বিজ্ঞান আর আধুনিক সভ্যতার এ যুগে ইসলামের কার্যকারিতা নাকি নিঃশেষ হয়ে গেছে। ডঃ হাসান জামান জোর দিয়ে বলেছেন জ্ঞান বিজ্ঞান আর আধুনিকতার কোন উপকরণকেই ইসলাম নিরুৎসাহিত করেনি, উল্টো ইসলামই একমাত্র ধর্মদর্শন যা বস্তুকে বিশ্লেষণ করতে বলেছে। আধুনিকতার যে Concept তার জন্ম যাবতীয় ধর্মাদর্শের অস্বীকৃতি থেকে। এই বিশিষ্ট Concept কে ইসলাম বর্জন করেছে ঠিকই কিন্তু আধুনিকতার যে সমস্ত উপকরণ যা বিজ্ঞান সাধনার দ্বারা অর্জিত হয়েছে তাকে বর্জন করেনি, উল্টো তাকে সহজভাবে গ্রহণ করবার মত শক্তি ইসলামের মধ্যে নিহিত আছে। আধুনিক জীবনের সাথে তাল মিলিয়ে চলবার জন্য ইসলামের এই গ্রহণ করবার সামর্থ্যকে ইকবাল ইজতিহাদের মাধ্যমে অর্জনের কথা বলেছেন এবং এই ইজতিহাদের নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইসলাম হয়ে উঠতে পারে আরো জীবন্ত ও সৃষ্টিশীল।

ইকবালের মতই হাসান জামান ইজতিহাদের ধারণাকে জোরালোভাবে সমর্থন করেছেন। তার এ সমস্ত চিন্তাভাবনার কথা ইসলামী তমদ্দুন, সমাজ সংস্কৃতি-সাহিত্য প্রভৃতি গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

ইসলামকে তিনি প্রচলিত অর্থে বিবেচনা করেননি। তার কাছে ইসলাম এক জীবন দর্শনের স্বরূপে মূর্ত হয়েছিল। ইসলামের এই রূপ, ইসলামের এই ছবিই তিনি আজীবন ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করেছেন এক চিন্তানায়কের ভঙ্গীতে। হাসান জামানের বড় সাফল্য এখানেই।


www.pathagar.com

# বখতিয়ার খিলজী যদি না আসতেন

১.

এদেশে কেউ কেউ আছেন যারা বখতিয়ার খিলজীকে বিদেশাগত আক্রমণকারী হিসেবে চিহ্নিত করেন। যেমন উগ্র সাম্প্রদায়িক লেখক বঙ্কিমচন্দ্র করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যারা লিখেছেন যাদের মধ্যে এদেশের কেউ কেউ আছেন তারাও মনে করেন বহিরাগত একজন ব্যক্তি এদেশের অভ্যন্তরে এসে অন্ধকার যুগের সৃষ্টি করেছেন। যারা বখতিয়ার খিলজীকে বহিরাগত মনে করেন তারা কিন্তু সেন রাজাদের ঠিক সেরকমভাবে বহিরাগত হিসেবে চিহ্নিত করতে দ্বিধাগ্রস্ত হন। এ এক অদ্ভুত বৈপরীত্য। আমাদের দেশের ইতিহাস একশ্রেণীর সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকের হাতে পড়ে এরূপ নিগ্রহ ও লাঞ্ছনার পৌনপুনিক শিকার হয়ে চলেছে।

সেনরা এসেছিল কর্ণাটক থেকে। তারা শুধু বহিরাগতই নয়, রীতিমত নিষ্ঠুর বহিরাগত। তারা এদেশের ভাষাকে সংহার করেছে, নারীর সতিত্ব ধ্বংস করেছে, মঙ্গল প্রদীপ নিয়ে এসেছে। সেনদের রাজত্বেই এদেশে বর্ণবাদের উদ্ভব ঘটেছে। ইতিহাসের এসব সত্যকে পাশ কাটিয়ে যারা এ দেশের মজলুম মানুষের মুক্তির সিপাহসালার বখতিয়ার খিলজীকে বহিরাগত হিসেবে চিহ্নিত করে, তাদের উদ্দেশ্যের সততা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে বৈকি।

ধরে নেয়া যাক বখতিয়ার খিলজী যদি না আসতেন, এদেশে যদি মুসলিম শাসনের সূচনা না হতো তাহলে অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াতো। আসুন একটু বিবেচনা করা যাক।

২.

বখতিয়ার খিলজী যখন এ দেশে আসেন তখন বাংলা নামে প্রকৃত অর্থে সুসংহত কোন জনপদ কিংবা রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটেনি। প্রাচীন কালেও এ ভূখণ্ড ছিল বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত ভিন্ন ভিন্ন রাজন্যবর্গের শাসনাধীন। এ সব স্বাধীন অঞ্চলগুলো রাঢ়, বরেন্দ্র, পুন্ড্র, গৌড়, বঙ্গ, সমতট, হরিকেল ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল। এমনকি বখতিয়ার খিলজী যে অত্যাচারী সেনদের বিতাড়িত করে মুসলিম যুগের সূচনা করেন তারাও কখনো এ ভূখন্ড পুরোপুরি নিজেদের কব্জায় আনতে পারেনি। সেনরা বাংলার কতকাংশের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল মাত্র। মুসলমানরা আসার আগ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় নামে বা জাতি হিসাবে বাঙ্গালী শব্দটার তাৎপর্য অনেকটাই ধোয়াটে ছিল। কেননা বাংলা নামে এ ভূখণ্ডের কোন একীভূত অস্তিত্ব তখনও বাস্তবে সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। আর এখানকার অধিবাসীরাও উল্লেখিত হতো বিভিন্ন স্বাধীন অঞ্চল বা ভূখণ্ডের নামে। প্রকৃত পক্ষে রাষ্ট্রীয় নামে এবং জাতিগতভাবে বাঙ্গালীদের বয়সকাল প্রায় সাড়ে ছয়শ বছর।

স্বাধীন সুলতানী আমলে ১৩৫২ সালে লাখনৌতি সাতগাঁও– সোনারগাঁও– নামের তিনটি পৃথকভাবে স্বাধীন অঞ্চলকে একীভূত করে সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াশ শাহ মুলক-এ-বাঙ্গালার উদ্ভব ঘটান। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ও ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের মত ঐতিহাসিকরাও এ কথা মেনে নিয়েছেন। ফলে সুলতান ইলিয়াস শাহ অভিহিত হন শাহ-ই-বাঙ্গালাহ, শাহ-ই-বাঙ্গলীয়ান, সুলতান-ই-বাঙ্গালাহ বলে।



www.pathagar.com

মোঘল আমলে এ ভূখণ্ড অভিহিত হতো সুবে বাঙ্গালাহ বলে। ডঃ এম এ রহীম এ প্রসঙ্গে বলেনঃ

মুসলিম শাসনের আগে বাংলা নামে কোন দেশ ছিল না। বাংলা নামটি এ দেশের জন্য অপরিচিত ছিল। এ দেশের অধিবাসীদের জন্য বাঙ্গালী পরিচয় কিংবা তাদের ভাষার বাংলা নামকরণ তখনো হয়নি। মুসলিম শাসকরাই বাংলার সবগুলি অঞ্চলকে একটি রাজনৈতিক ঐক্যে সংহত করেন এবং এই নবসংগঠিত অঞ্চলের 'বাংলা' নাম ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত করেন। (বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস)

তাতে করে স্পষ্ট হচ্ছে বাংলায় মুসলিম শাসন শুরু হবার আগে এ জনপদের অধিবাসীদের রাষ্ট্রিক ও জাতিক চেতনা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।

সেনরাতো এ দেশের অধিবাসীই ছিল না। কর্ণাটক থেকে আগত এ বহিরাগত রাজন্যবর্গ এ দেশে শোষকের ভূমিকাই পালন করে গেছে। বিদেশাগত মূল্যবোধ ও ভাষা চাপিয়ে দিয়ে তারা স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে একটি কৃত্রিম বিভাজন সৃষ্টি করেছে মাত্র। বৌদ্ধরা ছিল এ দেশেরই মানুষ। তাদের শাসকরাও ছিল এ দেশীয়। রাষ্ট্রীয়ভাবেও তারা একটি সাম্যবাদী সংস্কৃতির চর্চা করেছে। কিন্তু বৌদ্ধ আমলে ধর্মীয় পরিচয়ের বাইরে রাষ্ট্রিক ও জাতিকতার দিক দিয়ে বাঙ্গালী পরিচয় কখনোই পরিশ্রুত ও মূর্ত হয়ে ওঠেনি। এক অখণ্ড বাঙ্গালী জাতিসত্তার খবর বৌদ্ধ আমলেও অনুপস্থিত রয়ে গেছে। খৃস্টিয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে বাংলার স্বাধীন গঙ্গরিডী জাতির বিচ্ছিন্ন খবরটুকু ছাড়া ঐতিহাসিকরাও এ সময়ের তেমন কিছু তথ্যদি আমাদের দিতে পারেননি। তবে এ কথা স্পষ্ট গঙ্গরিডী জাতির জাতিক পরিচয় বাঙ্গালী ছিল না এবং তার আগের আদিম মানুষদের বাংশধর, পরবর্তীকালে এ দেশের অন্ত্যজ জাতি বলে চিহ্নিত কোল-শবর-পুলিন্দ-হাড়ি-ডোম-চন্ডালেরাও জাতিকতার দিক দিয়ে বাঙ্গালী পরিচয়ে মূর্ত হয়ে ওঠেনি কখনো। মুসলমান সুলতানেরা অনেকেই বাইরে থেকে এসেছিলেন সত্য; কিন্তু এ ভূখণ্ডকে তারা যেমন আপন করে নিতে পেরেছিলেন তেমনি স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে একাত্ম হতে তাদের মোটেই অসুবিধা হয়নি। সে কারণেই তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়েছিল একটি রাষ্ট্রিক ও জাতিক পরিচয় খাড়া করা, সেন আমলে ও পরবর্তীকালে ইংরেজ আমলে যেটা হতে পারেনি। কেননা তারা জাতির এই সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ না করে শোষকের ভূমিকাকেই প্রলম্বিত করতে চেয়েছে। বখতিয়ার খিলজীর আগমনের মধ্য দিয়ে এদেশের রাষ্ট্রিক ও জাতিক পরিচয় নির্ণিত হতে পেরেছে। তিনি না এলে, মুসলিম শাসনের সূচনা না হলে হয়তো এগুলো কখনোই সম্ভবপর হতো না।

৩.

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নির্মূল করবার জন্য সেনরা রাষ্ট্রীয়ভাবে আঘাত হেনেছিল। মুসলমানরা না এলে আজ বাংলা ভাষার কোন অস্তিত্ব থাকতো কিনা সন্দেহ।

সেনদের আগে বৌদ্ধ আমলে বাংলা ভাষার ব্যাপক চর্চা ছিল। পাল রাজাদের সময় বৌদ্ধ দোহা, ধর্মশাস্ত্র, সাহিত্য ইত্যাদি বাংলা ভাষায় রচিত হতো।

জনগণের ভাষার এই সমৃদ্ধি কিন্তু সেদিন আর্য ব্রাহ্মণরা সহ্য করতে পারেনি। সেনরা ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তারা বৌদ্ধদের সাথে সাথে বাংলা ভাষাকেও উৎখাত করতে ব্রতী



www.pathagar.com

হয়। তারা বৌদ্ধ বিহারগুলি ধ্বংস করে দেয়। এই বিহারগুলিই ছিল সেদিনের সাহিত্য সংস্কৃতির প্রাণ কেন্দ্র। বিহারে রক্ষিত গ্রন্থাবলী বিনষ্ট হয় এবং বাংলা ভাষা বিনাশের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়।

ব্রাহ্মণরা বাংলা ভাষাকে ম্লেচ্ছ ভাষা বলে ঘৃণা করত এবং এ ভাষা চর্চা না করতে রীতিমত ধর্মীয় বিধানও প্রয়োগ করেছিল। বাংলা ভাষার এই বিপর্যয় রোধ করতে এগিয়ে আসেন মুসলমান সুলতানেরা। তারা রীতিমত রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে বাংলা ভাষার গৌরবকে ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হন। প্রফেসর আবদুল করীম যথার্থ লিখেছেনঃ বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি মুসলমান শাসনের অবদান। অতিরঞ্জন মনে হলেও কথাটি সত্য। (বাংলার ইতিহাসঃ সুলতানী আমল)

মুসলমান সুলতানেরা সেদিন গণমানুষের আশা আকাংখার কাছাকাছি পৌঁছাবার জন্য দেশী ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে মনোনিবেশ করেন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের জন্য তারা বাড়িয়ে দেন সহযোগিতার হাত। কৃত্তিবাস, মালাধর বসু, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, দ্বিজ শ্রীধর, চন্ডীদাস, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস, পিপিলাই প্রভৃতি কবিগণ মুসলমান সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, রামায়ন মহাভারতের অনুবাদ কর্মেও মুসলমান সুলতানদের উৎসাহ দেখবার মতো। সুলতানী বাংলার এই সাহিত্য ছিল রীতিমত সৃষ্টিশীল ও গতিমান। বিচিত্র বর্ণে ও বিভূতিতে সেদিন এই সাহিত্য বাংলার গণচিত্তকে দারুণভাবে উজ্জীবিত করেছিল। এতদিন বাংলা সাহিত্য ছিল দেবদেবী কেন্দ্রীক ও মন্দিরের ধর্মাশ্রিত। মুসলমান আমলেই বাংলা সাহিত্য দেবতার মন্দির থেকে বের হয়ে এসে সম্পূর্ণ মানবকেন্দ্রিক হয়ে উঠলো। মুসলমান সাহিত্যিকদের হাতেই প্রথম রচিত হয় আশ্চর্য সুন্দর রোমান্টিক প্রেম কাহিনী, যা একান্তই মানবিক। পদ্মাবতী, লাইলী মজনু, শিরী ফরহাদ, সায়ফুল মূলক বদিউজ্জামান, মধুমালতীর নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। মধ্যযুগে বাংলা ভাষার এই সমৃদ্ধির দিকে ইঙ্গিত করে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন উল্লেখ করেছেনঃ আমাদের বিশ্বাস মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ই বঙ্গভাষার এই সৌভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মুসলমানরা আসার পর শুধু বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধিত হয়নি, বাংলা ভাষাও একটি গতিশীল ও জীবন্ত ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। ইসলামের সংস্পর্শে আসার পর অজস্র আরবী, ফারসী, উর্দূ, তুর্কী শব্দ এবং নতুন রূপ, নতুন প্রকাশভঙ্গী ও বাকপ্রতিমা বাংলা ভাষার অবয়বে মিশে গিয়েছে। এগুলো ছাড়া বর্তমান বাংলা ভাষার অস্তিত্ব কল্পনা করা পীড়াদায়ক; রীতিমত অসম্ভব। এ সব শব্দমালা যেমন ইসলামকে অবলম্বন করে বিকশিত হয়েছে তেমনি প্রায় আটশ বছর ধরে উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে যে নতুন জাতিসত্তার বিকাশ ঘটেছে তাদের বিশ্বাস, জীবনদৃষ্টি, মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের নির্দেশক হয়ে আছে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উত্থানের পাশাপাশি মুসলিম রাজশক্তির তত্ত্বাবধানে এদেশে বাংলা সনেরও প্রচলন ঘটে। বাংলাদেশে এখন আমরা যে রীতিতে সাল গণনা করি মোঘলরা এ দেশ অধিকারের আগে তা ছিল অনুপস্থিত। এই সন গণনার রীতি আমরা নিজেরা আবিষ্কার করিনি। আমরা এটা পেয়েছি মোঘলদের কাছ থেকে। বর্তমান বাংলা সন প্রবর্তন করেন


www.pathagar.com

সম্রাট আকবর। আকবর এই সনের নাম দিয়েছিলেন ফসলি। রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য তিনি তদানীন্তন সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ আমীর ফতেহউল্লাহ সিরাজীকে দিয়ে এই সৌরাব্দ প্রবর্তন করেন। মোঘলদের আগে সুলতানী আমলে রাজকার্য চলত হিজরী সনে। হিজরী হলো চন্দ্রাব্দ। চন্দ্রাব্দে ঋতুর হিসেবে গরমিল হয় তাই আকবর বঙ্গাব্দের কথা ভেবেছিলেন। আমরা এখন সেই মোঘলদের শিখিয়ে যাওয়া বঙ্গাব্দকেই গ্রহণ করেছি আমাদের অব্দ হিসাবে।

৪.

ঐতিহাসিকরা বলেছেন মুসলমানরা আসার আগে এদেশের মানুষ সেলাই করা পোশাক পরতে জানতো না। মুসলমানরাই এদেশে কাটা কাপড় ও দর্জি শিল্পের প্রচলন করে। সেজন্যই দর্জিদেরকে আজও খলিফা নামে ডাকা হয়। মুসলমানরা সেলাই করা কাপড় প্রচলন করেছিল বলে হিন্দু ব্রাহ্মণরা কাটা কাপড় পরাকে গর্হিত অপরাধ বলে বিবেচনা করতো। আজও হিন্দু ব্রাহ্মণরা ধূতি ও একখণ্ড গলবস্ত্র জড়িয়ে পূজা অর্চনা ও যাগযজ্ঞ করে থাকে। পূজা পার্বন ও যাগযজ্ঞে সেলাই করা কাপড় পরা নিষেধ ছিল। আইন-ই-আকবরীতে আবুল ফজল লিখেছেনঃ বাংলার নারী পুরুষদের দেহের বেশির ভাগই নগ্ন থাকতো। কেবল কোমরের কাছে একটুখানি কাপড় থাকতো। মধ্যযুগের পোশাক সম্বন্ধে ডঃ এম. এ. রহীম লিখেছেনঃ উচ্চ শিক্ষিত শ্রেণীর হিন্দুগণ মুসলমানদের পোশাক পরিচ্ছদ গ্রহণ করেন। মুসলমান পোশাক পরিধান করা তাদের নিকট বিরাট সম্মানের ব্যাপার বলে বিবেচিত হতো। আনন্দ উৎসসের সময় হিন্দু অভিজাত ব্যক্তিগণ মুসলমানদের ন্যায় পোশাক পরতেন। (বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস)

ভদ্র সমাজে কিংবা বাইরে বের হবার মতো পোশাক হিন্দুদের কাছে অজ্ঞাত ছিল বলেই তারা মুসলমানদের হুবহু অনুকরণ করতে শুরু করে। হিন্দু কবি কৃত্তিবাস, বিজয়গুপ্ত, বৃন্দাবন দাসের কবিতায় হিন্দু রমনীদের মুসলমানী পোশাক পরিয়ে সর্বসমক্ষে তুলে ধরার নজীর আছে। তাছাড়া তাদের উপায়ও ছিল না। এ সব বর্ণনায় বলা হয়েছেঃ তারা ঘাঘরা, ওড়না এবং কাঁচুলি বা চোলি ব্যবহার করত।

শুধু প্রাচীন যুগ কেন এই মাত্র উনিশ শতকেও এ দেশের বাঙ্গালীরা পোশাক পরতে জানতো না। শ্রী শোভন সোম লিখেছেনঃ উনিশ শতকে ভদ্র বাঙ্গালীর ব্যবহারিক পোশাক ছিল না। তারা নবাবী আমলের ভদ্র পোশাক চোগা চাপকান-পাগড়ী পরতেন (জোড়া সাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর সংস্কৃতি-দেশ-ডিসেম্বর-১৯৯৮) তিনি আরো উল্লেখ করেছেনঃ রাজা রামমোহন রায় নবাবী আমলের পোশাক পরে অভিজাত সেজে ব্রাহ্ম সমাজে যেতেন। তিনি লিখেছেন ছবিতে দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ এমনকি রবীন্দ্রনাথকেও পাগড়ী, টুপি, চোগা চাপকান ইত্যাদি যেসব পোশাকে দেখা যায় সেই পোশাক মুসলিম জামানার উত্তরাধিকার। (প্রাগুক্ত)

সভ্যতার বিবর্তনের সাথে মানুষ পোশাককে গ্রহণ করেছে। নিজের মানসিকতা ও রুচির উত্তরণ ঘটিয়েছে সুসভ্যভাবে নিজেকে আবৃত করে। মুসলমানরা এসে অনাবৃত ও অসভ্যতার অন্ধকারে নিমজ্জিত বাঙ্গালীকে আলোকের দিকে এগিয়ে নিয়ে এসেছিল এটা বলা কি এখন অতিরঞ্জন হবে?



www.pathagar.com

শোভন সোম অন্যত্র লিখেছেনঃ রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথদের তিন ভাই-এর সঙ্গে (এক পার্টিতে) চললেন ধূতি পাঞ্জাবী ও চটি পরে। পার্টিতে তাদের সাজ পোশাক দেখে হতভম্ব। কেউ তাদের সংগে কথা বললেন না। পার্টি যারা দিয়েছিলেন আর যারা পার্টিতে গিয়েছিলেন তারা বলেছিলেন, এ কি রকম ব্যবহার, এ কি রকম অসভ্যতা। লেডিজদের সামনে খালি পায়ে আসা। (প্রাগুক্ত) মোজাবিহীন খালি পায়ে পার্টিতে গিয়ে ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী বলে কথিত রবীন্দ্রনাথকেও একদিন অসভ্য গালি খেতে হয়েছিল। সেই থেকে রবীন্দ্রনাথ ধূতি পাঞ্জাবী প্রায় বাদ দিয়ে দার্জিলিংএ দেখা তিব্বতীদের বকুর সংগে মুসলমানী আলখেল্লা মিলিয়ে মাথায় ঈষৎ হেলানো তুর্কী টুপির বদলে এক ধরনের লম্বা টুপী ও পায়ে মোজাসহ নাগরাই ব্যবহার করতেন। কারণ তখন সেলাইবিহীন কাপড় সভ্য সমাজ থেকে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হচ্ছিল। শ্রী শোভন সোম লিখেছেনঃ

মজলিসে যেতে হত কাটা কাপড় পরে। ধূতি চাদর চলত না। আবার হিন্দুর বিয়ে, শ্রাদ্ধ পূজা ইত্যাদিতে ধূতি চাদর পট্টবস্ত্র পরতে হত, কাটা কাপড় চলত না। (প্রাগুক্ত)

এই যদি হয় বাঙ্গালী সংস্কৃতির পীঠস্থান বলে কথিত জোড়া সাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর অবস্থা তাহলে এ দেশের আপামর বাঙ্গালীদের কি অবস্থা ছিল ভাবাই যায় না।

৫.

মুসলমানরা বাংলায় আসার আগে এখানকার মানুষের খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্য ব্যবহারের মধ্যে বৈচিত্রময় তেমন কিছুই ছিল না। প্রচলিত ভাত ও মাছের বাইরে শুক্তো, ভর্তা, ব্যঞ্জন ও প্রায় মশলাবিহীন ছালুন এই ছিল এখানকার মানুষের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত। মিষ্টি, দুধ, মধু, ঘি, পান সুপারীর উল্লেখও আমরা কিছু কিছু পাই। অতিথি আপ্যায়নে ও উৎসব অনুষ্ঠানে আধুনিককালের মত রকমারী খাবারের আয়োজনের কথা প্রাক মুসলিম বাংলায় প্রায় অনুপস্থিত।

পাকপ্রণালী যে রীতিমত একটা শৈল্পিক ব্যাপার এ ধারণা মুসলমানরাই এদেশে প্রথম নিয়ে আসে। আধুনিককালের কোন অনুষ্ঠানই পোলাও অথবা বিরিয়ানী ব্যতীত চিন্তা করা যায় না। বাংলায় মুসলমানরাই এগুলির প্রচলন করে। মাংসের তৈরী কোর্মা, কালিয়া, কোপ্তা, কাবাব, রেজালাও মুসলমানদের হাত দিয়ে এদেশে প্রচলিত হয়।

তখন পর্যন্ত এ দেশে চায়ের প্রচলন হয়নি। মুসলমানরা অতিথি আপ্যায়নে ব্যাপকভাবে শরবতের রেওয়াজ চালু করে।

মিষ্টি খাদ্য দ্রব্য ও তরকারীতে সুগন্ধী ও মশলার ব্যবহারও মুসলমানদের হাত দিয়ে এ দেশে এসেছে। এলাচী, দারুচিনি, লবঙ্গ, কিসমিস থেকে শুরু করে পিয়াজ, রসুন, আদার ব্যবহারও মুসলমানদের অভিনব রন্ধন প্রকৌশলের ফল।

৬.

মুসলমানরা আসার ফলে এখানকার সুকুমার কলা ও স্থাপত্য শিল্পে পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয়। উত্তর ভারতে মুসলমানরা সংগীতের ক্ষেত্রে যে অসামান্য অবদান রাখতে শুরু করেছিল তার হাওয়া বাংলায় এসে শীতল স্পর্শ বুলিয়ে যায়। কিছু কিছু নতুন সুর ও রাগিনীর প্রচলন


www.pathagar.com

ছাড়াও প্রথমবারের মত মুসলমানরা বাংলাদেশে সানাই (শাহ-নাই শব্দের অপভ্রংশ) সেতার ও তবলার ব্যবহার চালু করে।

মুসলমান আমলেই এদেশে বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলে জনপ্রিয় ভাটিয়ালী সংগীতের প্রচলন হয়। ভাটিয়ালী সংগীতের একটি বিশেষ ধারা মুরশিদী বাংলার গণমানসের উপর সুফী মতবাদের প্রভাবের ফল। আধ্যাত্মিক রসাশ্রিত এই জনপ্রিয় সংগীত মানবের আকুল পিয়াসী মনের এক নান্দনিক কারুকৃতি। বাংলা সংগীতে মুসলমানদের আর একটি অবদান হলো জারি। এই জারী যারা পরিবেশন করে তাদেরকে বলা হয় বয়াতী।

বাংলাদেশে মুসলিম কলা ও সৌন্দর্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে নগর স্থাপত্যে। মুসলিম সভ্যতা মূলত নগর নির্ভর। মুসলমানরা যেখানেই গিয়েছে নাগরিক সভ্যতার জন্ম দিয়েছে ও বিরাট সৌধরাজি জমকালো ইমারত, মসজিদ মাদ্রাসা নির্মাণের মাধ্যমে তাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে। মুসলিম স্থাপত্যের ধরনটা ঠিক বৌদ্ধ ও হিন্দু স্থাপত্য রীতির মত নয়। বৌদ্ধদের বিহার ও হিন্দুদের মন্দির উভয়ের গঠন প্রকৃতির মধ্যে যে জিনিটা লক্ষ্য করা যায় তা হলো আল্লাহর দেয়া আলো ও বাতাস থেকে একে বিচ্ছিন্ন করার একটা প্রচেষ্টা। বৈরাগ্য ও সংসার মুক্তির ধারণা থেকে এ ধরনের বিচ্ছিন্নতার উপলব্ধি মূর্ত হয়েছে। মসজিদের স্থাপত্য রীতিটা আলো ও বাতাস মিলিয়েই। মসজিদে নামাযের সময় স্থান সংকুলান না হলেও মানুষ বাইরে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পারে। কিন্তু মন্দিরে সেটা সম্ভব নয়। এই ব্যাপারটা কেবল সম্ভব হয়েছে স্থাপত্য কুশলতার জন্য। এই স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যই বাইরের আলো ভিতরে প্রবেশ করবে; বাইরের পরিসর ভিতরে একাকার হয়ে যাবে। এ স্থাপত্য রীতির ধারণাটা শুধু সেকালে নয় একালেও বিভিন্নভাবে অনুসৃত হচ্ছে। যেমন আধুনিক বাড়ির বাইরে থেকে খানিকটা গৃহের ভিতর প্রবেশ করে তারপর সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠার কিংবা ড্রইং রুমের ভিতর দিয়ে সিড়ি নির্মাণের প্রচলন মুসলিম স্থাপত্য রীতি থেকেই এসেছে।

যারা মুসলিম সংস্কৃতিকে সকল দুর্গতির চিহ্ন বলে ইঙ্গিত করেন আর এদেশে মুসলমানের আগমনকে মনে করেন বৈদেশী আগ্রাসন তাদের ভাবা উচিত মুসলমানরা না এলে আজও এ ভূখণ্ড অর্ধসভ্যতার অন্ধকারেই তলিয়ে থাকতো। আমরা যদি ইতিহাসের এ মূল্যায়ন যথাযথভাবে না করি তাহলে ইতিহাস আমাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধই নেবে মাত্র।



www.pathagar.com

# প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ

ইবরাহীম খাঁ কামাল পাশা ও আনোয়ার পাশা নামে দুটো নাটক লিখেছিলেন। শিল্পের গুণাগুণ বিচারে এ নাটকের সফলতা ও বিফলতা নির্ণয় আজ গৌণ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এ নাটক ইবরাহীম খাঁর প্রখর সমাজ মনস্কতার প্রতিধ্বনি এবং তার কাল ও সময়ের স্মৃতির মিনার হয়ে সটান দাঁড়িয়ে আছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তুর্কী খেলাফত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। মুসলমানরা যখন দেখল সেই ছিন্ন-ভিন্ন খেলাফতের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে কামাল পাশা ও আনোয়ার পাশা রীতিমত গ্রীক বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে তাড়িয়ে দিতে শুরু করেছে তখন তাদের হৃদয়ে নতুন করে আশার আলো জেগে উঠলো। তারা ভাবতে শুরু করলো মুসলমানরা শুধু হারতে জানে না, হারাতেও জানে। কামাল পাশা ও আনোয়ার পাশা তখন মুসলমানদের কাছে বিজয়ের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। তাদের ব্যক্তিগত জীবন কিংবা বিশ্বাসের ধরন তখন তাদের বিচার বিবেচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়নি। ইব্রাহীম খাঁ এ নাটক রচনা করে সে বিষয়কে সমুন্নত করতে চেয়েছিলেন।

ইব্রাহীম খাঁ যখন কামাল পাশা ও আনোয়ার পাশাকে নিয়ে নাটক রচনা করছেন ঠিক সে সময়ই কাজী নজরুল ইসলাম লিখছেন তার বিখ্যাত কামাল পাশা ও আনোয়ার পাশা কবিতা। কালিক বিচারে দুজনেরই লেখালেখির পটভূমি ও প্রেক্ষাপট ছিল মোটামুটি এক। দুজনেরই চোখ ছিল ভবিষ্যতের দিকে যেখানে বর্তমানের হতোদ্যম ও হাতাশাক্লিষ্ট মুসলমানেরা একটা ক্রমজাগ্রত শক্তিমানতার প্রতীকে পরিণত হবে। ইবরাহীম খাঁ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করে তার কর্মকেন্দ্র বানিয়েছিলেন করটীয়াকে। সেকালের প্রেক্ষিতে তার মতো একজন সুশিক্ষিত তরুণ কর্মকেন্দ্র হিসেবে নগর জীবনকে সহজে ও সুলভে বেছে নিতে পারতেন। এবং সে সুযোগও তার যথেষ্টই ছিল। কিন্তু তার মধ্যে স্বাজাত্যবোধের প্রবলতা এত বেশি ছিল যে নিজের আশেপাশের সবাইকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি এবং করটীয়ার মায়াও তার পক্ষে কখনো কাটানো সম্ভব হয়নি। করটীয়ার জমিদার বাড়ীর সন্নিহিত স্কুলকে তিনি কলেজে রূপান্তরিত করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। করটীয়ার মতো একটা গ্রাম্য পরিবেশে সে সময় একজন মুসলমান তরুণের পক্ষে কলেজ প্রতিষ্ঠায় হাত দেয়া সহজ কথা ছিল না; যখন নাকি অবিভক্ত বাংলায় মুসলমান পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রায় ছিল না বললেই চলে। ইবরাহীম খাঁ সেই কাজে পুরোপুরি সফল হয়েছিলেন এবং তার মতো একজন প্রকৃত শিক্ষাব্রতীর ত্যাগ ও তিতিক্ষার সুবাদে এ কলেজটি একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। আমার মনে হয় তার নামের সাথে এসব কারণেই প্রিন্সিপাল শব্দটা একেবারেই একাত্ম হয়ে গিয়েছিল এবং কেউ আর পরবর্তীতে এটিকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনায় আনতে পারেনি। করটীয়াকে তিনি বাংলাদেশের আলীগড়ে রূপান্তরিত করেছিলেন এবং তার উৎসাহ উদ্দীপনায় এই বিদ্যায়তনের মুসলমান ছাত্ররা আত্মজাগরণকে জাতীয় জাগরণে রূপ দিতে সমর্থ হয়েছিল।



www.pathagar.com

এই করটীয়ায় বসেই তিনি নজরুল ইসলামের কবিতা পড়ে এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি তাকে চিঠি লিখে শুধু অভিনন্দনই জানাননি, নিরলসভাবে সাহিত্য চর্চার জন্য কবিকে তিনি করটীয়ায় এনে রাখতেও চেয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি করটীয়ার জমিদার চাঁদ মিঞার (ওয়াজেদ আলী খান পন্নী) যথাযথ অনুমোদনও নিয়েছিলেন। চিঠিতে ইবরাহীম খাঁ কবিকে মুসলিম জাগরণের প্রতিভূ হিসেবে চিহ্নিত করে, তাকে বাংলা সাহিত্যের জালালুদ্দীন রুমীর আসন নেয়ার জন্য উদাত্ত আহবান জানিয়েছিলেন।

কবির অবশ্য করটীয়া যাওয়া কখনো হয়নি। কিন্তু ইবরাহীম খাঁর চিঠির উত্তর তিনি দিয়েছিলেন বছর দুয়েক পরে সওগাত পত্রিকার মাধ্যমে। সওগাত সম্পাদক নাসির উদ্দীন সাহেব খাঁ সাহেবের চিঠির সাথে নজরুলের সদ্য লেখা চিঠিটা পত্রস্থ করে দেন যা সেকালের সাহিত্যমোদীদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। খাঁ সাহেব তার প্রিয় করটীয়াকে শুধু নিজের কর্মতীর্থ বানাননি। ধ্যানেরও তীর্থ বানিয়েছিলেন। খাঁ সাহেব শুধু শিক্ষকতা করেননি, করটীয়ার বিদ্যায়তনকে কেন্দ্র করে তিনি গড়ে তুলেছিলেন সাহিত্যব্রতীদের সংগঠন কাকলীকুঞ্জ। সেখানে কবিতা, নাটক, গল্প সবকিছুরই চর্চা চলতো। তার জীবনের সেরা লেখাগুলো এই করটীয়া বসেই লেখা। শুধু কি সাহিত্য সভা নিয়ে তিনি মেতে ছিলেন? তিনি ধর্মসভা করেছেন, সমাজ সংস্কারের হাত দিয়েছেন এমনকি সেকালের রাজনীতিতেও তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। রাজনীতিতে তার হাতেখড়ি হয়েছিল খেলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে। পরবর্তীতে তিনি ঝুঁকেছিলেন মুসলিম স্বাতন্ত্রবাদী চিন্তা চেতনার দিকে। পাকিস্তান আন্দোলন এক সময় বাঙ্গালী মুসলমানদের অন্তরকে আলোড়িত করেছিল। অনেকের জীবনে সে সময় পাকিস্তান আদর্শ হিসেবেই দেখা দিয়েছিল। ইবরাহীম খাঁ তার কালের বিশ্বাসকে ধারণ করেছিলেন এবং পাকিস্তান আন্দোলনে যথারীতি অকুণ্ঠভাবে শরীক হয়েছিলেন। এক তুড়িতেই পাকিস্তান উড়িয়ে দিলেই পাকিস্তানের ইতিহাস মুছে যায় না। ইবরাহীম খাঁর মতো নায়কেরা পাকিস্তান আন্দোলন করেছিলেন উত্তর প্রজন্মের ভালোর দিকে চেয়েই; সে কথা স্বীকার না করলে আমরা ইতিহাসের প্রতি সুবিচার করতে পারবো না।

মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী ইবরাহীম খাঁ তার লেখালেখিতেও এই চিন্তা ভাবনার অনুশীলন করেছিলেন। তার আত্মজৈবনিক স্মৃতি কথা বাতায়ন এ দেশের মুসলিম স্বাতন্ত্রবাদী আন্দোলনের স্বর্ণযুগকে ধারণ করে আছে। খাঁ সাহেবের একটা বিখ্যাত গ্রন্থের নাম হচ্ছে Anecdotes from Islam. সারা দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে থাকা ইসলামের গৌরবজ্জ্বল কাহিনীকে তিনি এ গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। এ এক অমানুষিক পরিশ্রমের কাজ। ইতিহাস আর সভ্যতার গতিকে ইসলাম কিভাবে ঘুরিয়ে দিয়েছিল, শত শত বছর ধরে পৃথিবীর এক বিরাট অংশের মানুষের উপর ইসলামী চিন্তা ও চেতনা যে অমূল্য প্রভাব বিস্তার করেছিল তার কিছু নজীর এ বইতে তিনি তুলে ধরেছেন। বিশ্বাসের জোর না থাকলে, কওমের প্রতি ভালবাসা না থাকলে এ রকম গ্রন্থ কখনোই লেখা সম্ভব নয়। আজ এ বিশ্বাসহীনতার যুগে, মূল্যবোধের অবক্ষয়ের যুগে ইব্রাহীম খাঁকে তাই বেশি করে মনে পড়ছে।



www.pathagar.com

# দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ঃ এক বিকেলের স্মৃতি

তার সাথে আমার প্রথম পরিচয় ও দীর্ঘতর আলাপচারিতার সৌভাগ্য এই একবার মাত্রই ঘটেছিল। তারপরে এই ঢাকা শহরের নানা আয়োজন ও অনুষ্ঠানের মধ্যে আমি তাকে বহুবার প্রত্যক্ষ করেছি এবং সর্বত্রই তার মনীষা ও বৈদগ্ধ্যের ছাপ আমাকে মুগ্ধ করেছে। ছেলেবেলা থেকেই তার নাম শুনে আসছি। এদেশের দর্শন চর্চা ও চিন্তার জগতে তিনি শুধু নামজাদা ব্যক্তি ছিলেন না, এককভাবে বলা চলে বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে দর্শন চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশটা তার হাত দিয়েই শুরু হয়েছিল। তিনি শুধু আমার মুরব্বী স্থানীয়ই ছিলেন না, ছিলেন দাদার বয়সী। তাই তার সঙ্গে আমার পরিচয়ের সৌভাগ্য ঘটে দেরিতে ১৯৮৬ সালে। তার সাথে আমার বয়সের এই দূর অতিক্রম্য ব্যবধান পরবর্তীতে তার সাথে আমার সম্পর্কের নিবিড়তা স্থাপনেও হয়ত একটা স্থায়ী প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

প্রথম পরিচয়ের প্রাক্কালেই তাকে মনে হয়েছিল এক দুর্লভ ব্যক্তি। বয়সের ভার যাকে কাবু করতে পারেনি, মনের উত্তাপে যিনি আগের মতই সাহসী ও যোদ্ধা রয়ে গেছেন। তার আনন্দোজ্জ্বল মনের এই ছবি তার প্রাণ পুরুষের এক সুন্দর পরিচয় এক অক্ষয় স্মৃতি হয়ে আমার চিত্তভান্ডারে এখন জমা হয়ে আছে। অনেককেই বলতে শুনেছি তিনি অতিবড় দার্শনিক;' আমাদের এই নিরুত্তাপ বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে জন্মগ্রহণ না করলে তিনি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের মর্যাদা ও সম্মান পেতেন। কথাটা বাহুল্য নয়।

আমাদের এই মিথ্যা কথন, চাটুকার ও বক্তৃতাকারের দেশে গুণীর মর্যাদা এতটাই স্বল্পমূল্য হয়ে গেছে যে কিছুদিন অতিবাহিত হলে তাদের খুঁজে পাওয়াই দুর্লভ হবে বৈকি। বাঙ্গালী মুসলমানের চিত্তবিকাশের ধারায় দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের অবদান মোটেও ছোট নয়। রাজনীতির সাথে তার স্বল্প সময়ের সম্পৃক্ততা থাকলেও তিনি ছিলেন মূলত বুদ্ধিবৃত্তি ও সংস্কৃতির জগতের লোক। রাজনৈতিক আত্মপ্রতিষ্ঠার সাথে সাথে সাংস্কৃতিকভাবেও বাঙ্গালী মুসলমানের আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবী যাতে সমুন্নত হয় এর সাধনা তিনি আমৃত্যু করে গেছেন। দর্শনের জগতে তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ পথিক। ধর্মকে বাদ দিয়ে একালে দর্শনচর্চার যে ঝোঁক চলছে তিনি তার পক্ষালম্বন করেননি। তার দর্শন ছিল ধর্মমূলক এবং ধর্মাশ্রয়ী এই দর্শনের মধ্যে তিনি মানবমুক্তির সন্ধান করেছেন।

১৯৮৬ সালের এপ্রিল কি মে মাসে তার সাথে আমার প্রথম দেখা হয়। এক বিকেলে আমার এক বন্ধু আনওয়ার-উল-করীমের সাথে তার রামপুরার বাসায় গিয়ে হাজির হই। তার বাসার ঠিকানাটা নিয়েছিলাম কথা শিল্পী শাহেদ আলীর কাছ থেকে। তিনিই আমাদের কাগজে ছবি এঁকে বাসার গন্তব্য বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তাই তার বাসা চিনতে অসুবিধা হয়নি।

আগেই শুনেছিলাম দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ হলেন বিখ্যাত হাছন রাজার দৌহিত্র। তখনও আমরা ছাত্র। তাই স্বাভাবিকভাবে তরুণ মনের অনেক ভাবনার মতো তার বাসার জমিদারী বিলাসের কল্পনাটাও আগে ভাগেই আমাদের মনের মধ্যে উকি দিয়েছিল আর কি।



www.pathagar.com

কিন্তু সেই বাসা যখন খুঁজে পেলাম তখন কল্পনার গতিতে ছেদ পড়েছে এবং আরও শুনলাম বাসাটা ভাড়া করা। যখন তার সঙ্গে দেখা হলো তখন মনে হলো এমন নিরাভরণ পরিবেশ রক্ষা করা বোধ হয় একজন দার্শনিকের পক্ষেই সম্ভব।

তার ঘরের দেয়াল জুড়ে র‍্যাকভর্তি শুধু বই আর বই। তার শোয়ার বিছানাটার একাংশ জুড়েও বই। আমার কাছে মনে হলো উনি বুঝি বইয়ের সমুদ্রের মধ্যেই রাতে ঘুমাতে যান, আবার সেই সমুদ্রের বুক থেকেই সকালে তার জাগরণ ঘটে। হাছন রাজা যৌবনে খুব অমিতাচারী জমিদার ছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে কি কারণে তার মনের পরিবর্তন ঘটে এবং পরিণত বয়সে তিনি মরমী সাধনায় নিমগ্ন হন। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ নানার এই মরমী ভাবটা পুরোপুরিই পেয়েছিলেন বোধ হয়। তার ব্যক্তিগত জীবনে, কথাবার্তা ও চলাফেরায় যারা তার এই সহজ সারল্য দেখেছে তারাই না স্বীকার করে পারবে না।

তার এই নিরাভরণ চালচিত্র দেখে আমার বন্ধু বোধ হয় খুব কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল। কথা প্রসঙ্গে সে আজরফ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেই বসলো স্যার আপনি কি ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে ঢাকায় একটা বাড়ি করতে পারেন না।

এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি সেদিন যা বলেছিলেন তা আজও আমার মনে হিরন্ময় হয়ে আছেঃ ব্যাঙ্কেতো সুদ দিতে হয়, এই গোনাহর কাজ কিভাবে করি।

ঈমানের জোর না থাকলে আজকের যুগে এরকম শক্ত কথা কারো পক্ষেই বলা সম্ভব নয়। আর তাছাড়া উদাহরণযোগ্য হিসেবে গড়ে তুলতে না পারলে অন্যকে উপদেশ দেয়া যায় না। আজরফ সাহেব নিজের ব্যক্তি জীবনে তার বিশ্বাসেরই জীবন্ত প্রতিচ্ছবি ছিলেন।

সেদিন বিকেলে আর কি কি বিষয়ে কথা হয়েছিল তার পুরোপুরি স্মরণে না থাকলেও অধিকাংশই যে সাহিত্য, শিল্প, দর্শন আর মোটের উপর একালে মুসলমানদের ভগ্নদশা ও তার প্রতিকারের উপায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা স্পষ্ট। আমাদের তরুণ মনের অনেক কৌতূহলী প্রশ্নের জবাবও তিনি সেদিন ধৈর্য ধরে দিয়েছিলেন মনে পড়ছে। কথা প্রসঙ্গেই তিনি দুঃখ করে বললেন মুসলমান আজ ইসলাম ছেড়ে দিয়েছে, কোরআন ছেড়ে দিয়েছে, তার সংস্কৃতিতে ইসলামের রূপ আর ছবি বিলীয়মান হয়ে যাচ্ছে, তোমরা কি করে আশা কর মুসলমান সমাজে উন্নতি প্রগতির জোয়ার শুরু হবে। মুসলমান আজ হতবিহ্বল এক জাতি। উন্নতির কথা, এগিয়ে যাওয়ার কথা বললেই আমরা এখন বুঝি পশ্চিমের কোন দেশের অনুকরণের কথা। অনুকরণ করে কি কেউ বড় হতে পারে। আজরফ সাহেব সেদিন আর একটা কথা খুব ভাল বলেছিলেন। মুসলমান সমাজের এখন একটা বড় ব্যাধি হচ্ছে এর অনৈক্য। এই অনৈক্যই মুসলমানের শত্রুকে আরো বেশি করে শত্রুতা করতে সাহস যোগাচ্ছে। মুসলমান দুনিয়ায় এখন জাতীয়তাবাদ রোগের প্রাদুর্ভাব চলছে। ইউরোপ থেকে আসা এ মহামারী মুসলমান দেশগুলোকে খণ্ড বিখণ্ড করে ফেলেছে। তিনি আক্ষেপের সুরে বললেন মুসলমানের ঐক্যের ভিত্তি হচ্ছে তৌহীদ, আর আমরা জাতিবাদ নিয়ে মারামারি করে মরছি। তিনি ইকবালের রমুযে বেখুদীর জাতিবাদ বিরোধী বিখ্যাত চরণগুলো মূল ফার্সী থেকে আমাদের আবৃত্তি করে শোনালেন। তার স্বতঃস্ফূর্ত ফার্সী কবিতার আবৃত্তি এখনও আমার কানে বাজে। অনূদিত চরণগুলো আমি নিচে উদ্ধৃত করছি–



www.pathagar.com

অন্তর আমাদের যুক্ত নয়
সিরিয়া, তুরস্ক বা ভারতের সাথে
জন্মভূমি আর কোথাও নয়
ইসলাম ছাড়া;
মুসলিম তুমি-
আবদ্ধ করো না তোমার অন্তর
কোনো দেশের বন্ধনে
হারিয়ে ফেলো না তোমার আপনাকে
বিরোধের বিশ্বে;
জয় কর অন্তর,
কারণ তার বিপুল প্রসারের মাঝে
আত্ম বিলুপ্ত হোতে পারে
জল ও কর্দমের সমগ্র পান্থনিবাস।

ছাত্র জীবনে আজরফ সাহেবের একটা বিষয় ছিল ফার্সী এবং তিনি এতে পরীক্ষায় লেটার পেয়েছিলেন বলে জানালেন। এ রকম বহু ফার্সী কবিতার চরণ তার মুখস্থ ছিল এবং তা তিনি অবলীলাক্রমে গড় গড় করে বলে যেতে পারতেন। শুধু তাই নয় হিন্দুদের রামায়ন মহাভারত থেকেও লাইনের পর লাইন তিনি মুখস্থ আবৃত্তি করতে পারতেন। তার এই অদ্ভুত স্মৃতি শক্তির কথা তার শুভানুধ্যায়ী বন্ধু ও অনুরাগীরা ভাল করেই জানতেন।

আসবার সময় তাকে একটা প্রশ্ন করেছিলাম স্যার, জাতীয়তাবাদ যদি ইসলাম সম্মত নাই হয়, তবে আপনারা কেন রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন করতে গেলেন; ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেইত এদেশে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটেছিল।

তিনি স্মিত হেসে বললেন ভাষা আন্দোলন এক কথা, আর জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে অন্য কথা। কোরআনে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের বর্ণ, ভাষা ও গোত্রের বৈচিত্রের কথাও আছে। পাকিস্তান ছিল বহুভাষাভাষী মানুষের দেশ। সে রকম একটা দেশে ভাষার এই বৈচিত্রের দাবী প্রতিষ্ঠার কথাই আমরা বলেছিলাম। যারা ভাষা নিয়ে রাজনীতি করেছে, ভাষার সাথে যোগ করে জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার কথা ভেবেছে তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। তারা এ অঞ্চলের মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তার দিকটি অত্যন্ত নির্দয়ভাবে মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে। তাদের সাথে আমি অন্তত একমত নই।

আজরফ সাহেবের এ কথাটা ভাববার মতো বিষয় বটে। যারা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন নিয়ে পরবর্তীতে নিজেদের খেয়াল খুশীমত বিভিন্ন রকমের ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছেন তাদের সাথে এ আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত একজন কর্মীর এই ব্যাখ্যার কোন মিল নেই। ইতিহাসের স্বচ্ছতার প্রয়োজনেই ভাষা আন্দোলনের মুল্যায়নে আজরফ সাহেবের কথাগুলো তাই বিবেচনা করার যোগ্য।

তার কাছ থেকে যখন বিদায় নিয়ে চলে আসি তখন তিনি আমাদের জন্য প্রাণভরে দোয়া করলেন এবং কাঁপা কাঁপা গলায় হাতে দুটো কমলালেবু আমাদের দিয়ে বললেন এটা তোমরা খেয়ে নিও। সেই কমলালেবুর স্বাদ আর খুশবু এখনো গভীরভাবে অনুভব করি।



www.pathagar.com

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক ফাহমিদ-উর-রহমান এই পেক্ষাপটে ইসলাম ও মুসলমানদের সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতি রাজনীতি শিক্ষা ইতিহাস ইত্যাকার বিষয়াবলীকে সঠিক ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার প্রয়াসে এই রচনার অবতারণা করেছেন। প্রত্যেকটি রচনার মধ্যে তিনি যে ইসলামী ভাবধারা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন তা তাঁর এই রচনাগুলিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। গতানুগতিকভাবে আমরা যে বিষয়গুলি জানতাম সেগুলির মধ্যে যে আরো গভীরতর তথ্য ও বাণী রয়েছে তা উদ্ধার করার চেষ্টা লেখক করেছেন। এ বিষয়ে পাঠকগণ অবশ্যই নতুনভাবে চিন্তা করতে পারবেন। বিশ শতকী চিন্তার অতলে তলিয়ে না গিয়ে তারা যাতে নতুনভাবে নিজেদেরকে উজ্জীবিত করতে পারেন এবং ইসলামী চিন্তার গতিময়তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন এই উদ্দেশ্যে আমরা এ প্রবন্ধ সংকলনটি প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছি। আশা করি পাঠকগণ এতে লাভবান হবেন।

- প্রকাশক

ISBN-984-485-062-2